প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃতি পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

প্রথম পরিমার্জিত সংস্করণ ঃ মে, 2018

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education
Bureau of the University Grants Commission

পরিচিতি

বিষয় ঃ শিক্ষা

স্নাতকোত্তর স্তর

পাঠক্রম : পর্যায়

PG Education : 05 : 1 & 2

	রচনা	সম্পাদনা
একক **1–5**	অধ্যাপিকা অঞ্জলি রায়	অধ্যাপক নৃসিংহকুমার ভট্টাচার্য
একক **6–10**	অধ্যাপিকা অঞ্জলি রায়	অধ্যাপক নৃসিংহকুমার ভট্টাচার্য

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনওভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PG Education : 05

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পর্যায়—1

একক 1 ❑	শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ধারণা, প্রকৃতি ও পরিধি	7-18
একক 2 ❑	নির্দেশদানের নকশা ও সূচীবন্ধ নিবিড় শিখন	19-44
একক 3 ❑	শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষণ মডেল	45-54
একক 4 ❑	যোগাযোগ এবং শ্রেণিকক্ষে ভাবের আদান-প্রদান	55-62
একক 5 ❑	শিক্ষণ প্রকরণ এবং শিক্ষা কার্যক্রমের ধারা	63-80

পর্যায়—2

একক 6 ❑	পাঠক্রমের ধারণা	81-105
একক 7 ❑	পাঠক্রমের ভিত্তি ঃ দার্শনিক, মনোবৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্ত্বিক	106-116
একক 8 ❑	শিখনের তত্ত্ব ও পাঠক্রম	117-129
একক 9 ❑	পাঠক্রম রচনা	130-145
একক 10 ❑	পাঠক্রমের মূল্যায়ন	146-154

একক ১ □ শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ধারণা, প্রকৃতি ও পরিধি (Concept, Nature and Scope of Educational Technology)

গঠন (Structure)

১.১ সূচনা

১.২ উদ্দেশ্য

১.৩ শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ধারণাগত ভিত্তি ও সংজ্ঞা

১.৩.১ শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সংজ্ঞা

১.৪ শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের প্রকৃতি

১.৫ শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য

১.৫.১ সাধারণ উদ্দেশ্য

১.৫.২ বিশেষ উদ্দেশ্য অথবা শ্রেণিকক্ষের প্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রযুক্তির লক্ষ্য

১.৬ শিক্ষা প্রযুক্তির পরিধি

১.৭ শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

১.৮ শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের উপাদান

১.৮.১ হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার দৃষ্টিভঙ্গী

১.৮.২ সফ্টওয়ার দৃষ্টিভঙ্গী

১.৮.৩ হার্ডওয়ার দৃষ্টিভঙ্গী

১.৯ শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান ও নির্দেশদান প্রযুক্তি বিজ্ঞান

১.১০ সারসংক্ষেপ

১.১১ প্রশ্নাবলি

১.১ □ সূচনা (Introduction) :

মানুষের জীবনে মূলত: দুই ধরনের চাহিদা কাজ করে। একটি হল তার দৈহিক চাহিদা (Physiological need), আর অপরটি হল সুস্থ জীবনযাপন সামাজিক অভিযোজন। মানুষের জীবনে এই দুই চাহিদার গুরুত্ব অপরিসীম। সুস্থ দেহ ও জীবনের স্থায়িত্ব বজায় রাখার স্বার্থে যেমন দৈহিক চাহিদাকে সঠিক ভাবে পূরণ করতে হয়, তেমনি জীবনের নিরাপত্তা বোধ, সামাজিক অভিযোজন, উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির স্বার্থে মানুষের মানসিক চাহিদাকে যথার্থ ভাবে চরিতার্থ করা একান্ত প্রয়োজন। মানুষ উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমেই এই দুই চাহিদার পূরণের সঠিক জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করতে পারে। শিক্ষাই মানুষকে তার দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ ও উন্নয়নে সাহায্য করে। এই কারণে শিক্ষা ব্যক্তিগত দিক থেকে এবং সামাজিক দিক থেকে মানুষের জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

সাধারণভাবে 'শিক্ষা' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। সমাজ জীবনের বিবর্তনের সাথে তাল রেখে শিক্ষাবিদ্, চিন্তাবিদ ও দার্শনিকরা 'শিক্ষা' শব্দটিকে নানা ভাবে ব্যবহার করেছেন। শিক্ষার বুৎপত্তিগত অর্থকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষা শব্দটি এসেছে শাস্ ধাতু থেকে। সাধারণতঃ শিক্ষা শব্দটির অর্থ হল—নিয়ন্ত্রিত করা, শৃংখলিত করা, নির্দেশ দান করা, ইত্যাদি। আবার কোন কোন সময় 'শিক্ষা'কে বিশেষ 'কৌশল' হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। বুৎপত্তিগত অর্থের সাথে সঙ্গতি রেখে সেই শিক্ষাকে তাই অনেকে আবার নিয়ত পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হওয়ার ক্ষমতার বিকাশ বলে মনে করেন। প্রয়োজনের স্বার্থে শিক্ষণ ক্ষমতাকে উন্নত ও সহজ করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে নানারকমের শিক্ষণ সামগ্রী, পুস্তক, প্রযুক্তি ইত্যাদি।

উপযুক্ত অভিযোজনের লক্ষ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা পদ্ধতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার এক নতুন দিকের পথ খুলে দেয়। আর উপযুক্ত পদ্ধতি ও প্রযুক্তির মেল বন্ধনের মাধ্যমে জন্ম নেয় একটি নতুন অধ্যায়। যার নাম হল 'শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান' (Educational Technology)। এই শিক্ষা প্রযুক্তির বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে উপযুক্ত পদ্ধতি ও উপকরণের কার্যকরী সমন্বয় ঘটিয়ে শিক্ষণ শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সহজ ও তরান্বিত করতে সাহায্য করা ও শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটানো। এই 'শিক্ষা প্রযুক্তি'কে আবার ইংরেজীতে বলা হয় Educational Technology.

১.২ ❑ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের : ধারণা ও সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- এই বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষা প্রযুক্তির পরিধি ও সীমাবদ্ধতা বলতে পারবেন।
- শিক্ষাপ্রযুক্তির উপাদান গুলি বর্ণনা করতে পারবেন
- নির্দেশদানের সঙ্গে এর সম্পর্ক উল্লেখ করতে পারবেন।

১.৩ ❑ শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ধারণাগত ভিত্তি ও সংজ্ঞা (Educational Technology)

শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ধারণাগত ভিত্তিকে বুঝতে হলে এর মূল উপাদান সম্বন্ধে একটি সম্যক ধারণার প্রয়োজন। ইংরেজিতে প্রযুক্তি (Technology) কথাটি গ্রিক্ শব্দ Technic থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এই কথাটির মানে হচ্ছে দক্ষতা বা প্রকৌশল। আর Logia শব্দের মানে হচ্ছে বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান। অর্থাৎ 'শিক্ষা প্রযুক্তি' বিজ্ঞান হচ্ছে—শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে অথবা শিক্ষণ কার্যক্রম সহজ করা ও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ করা। আধুনিক কালে 'শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান' হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে ও প্রসারের মূল চাবিকাঠি। শুধু তাই নয় সকলের জন্য শিক্ষা এই সামাজিক প্রক্রিয়ার সর্বজনীন আবেদন ও স্বীকৃতি লাভের ক্ষেত্রে 'শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান' বিশেষ সামাজিক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাই

একে একটি বিশেষ সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে অনেকে মনে করে থাকেন। শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান একদিকে যেমন শিক্ষণ তত্ত্ব, উপকরণ ও প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত অন্যদিকে এই প্রযুক্তি বিজ্ঞান মানুষের জীবন ও অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্ক যুক্ত। তাই শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানকে শুধুমাত্র শিক্ষালাভের প্রধান চাবিকাঠি না ভেবে 'শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান'কে অনেকে শিক্ষা উন্নয়নের একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে মনে করেন।

১.৩.১ শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সংজ্ঞা :

শিক্ষাবিদ্ ও মনোবিদ্‌রা নানা ভাবে শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছেন। নীচে এরকম কয়েকটি সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করা হল।

জি, ও, এম লেথ (G.O.M. Leith, 1967) মনে করেন, শিক্ষার প্রসার, মানোন্নয়ন ও উপযোগিতার বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষার্জন ও শিক্ষাদানের উপযুক্ত শর্ত ও পরিবেশ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ হল শিক্ষা প্রযুক্তি (Educational Technology is defined as an application of scientific knowledge about learning and the conditions of learning to improve the effectiveness and efficiency of teaching and training)

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের তিনটি প্রধান দিক্ রয়েছে। এগুলি হল—

—শিক্ষার মূল লক্ষ্য স্থির করা।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষণ অনুক্রম (Learning sequence) স্থির করা।

—উপযুক্ত মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষা পদ্ধতি ও নীতির সফলতা ও ব্যর্থতার সূচক (indicator) নির্দেশ করা।

জন লিডহ্যামের (John Leedham, 1973) মতে শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিখন ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আধুনিক রীতিনীতির সুসংহত প্রয়োগ করা ("Educational Technology concerns the systematic use of modern methods and technologies in teaching and learning)। লিডহ্যাম এর মতে শিক্ষাপ্রযুক্তি বিজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও ব্যবহার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে শিক্ষককে শিক্ষার ধারাবাহিক ভাবনার সাথে আধুনিক রীতিনীতির মেলবন্ধন ঘটানোর জন্য উদ্যোগী হতে হবে।

ডি, চিকো (De Ceoco, 1971) আবার শিখনের মনস্তাত্ত্বিক দিক গুলোকে সবিস্তারে বাস্তবে প্রশিক্ষণে প্রয়োগ করাকেই শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান বলে মনে করেন। অর্থাৎ শিখন তত্ত্বের প্রয়োগিক দিক্ গুলোর গুরুত্ব এখানে প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত।

রিচমন্ড (W.K. Richmond, 1979) এর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুযায়ী উপযুক্ত শিখন পরিবেশ ও শিখন শিক্ষণ কৌশল রচনা করার নিরিখে যে বিজ্ঞান জড়িত, তাই হল শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান (Educational Technology can be understood as meaning the development of a set of systematic Techniques and accompanying practical knowledge for designing testing schools as education system."

বি, পি, লুলা (B.P. Lulla) আবার শিক্ষা-প্রযুক্তি বিজ্ঞানে পদ্ধতি ও কৌশলের উপর গুরুত্ব আরোপ

করেছেন। তার মতে শিক্ষা প্রযুক্তি হল শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কৌশলের প্রয়োগ।

ডি, আনউইন (D, Unwin, 1969) এর মতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনে আধুনিক কৌশল ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারিক প্রয়োগ করাই হল শিক্ষা-প্রযুক্তি বিজ্ঞান (Educational Technology is concerned with the application of modern skills and techniques to requirement education and training। তাই শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান সাধারণ পরিবেশ পদ্ধতি এবং মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রিত করে শিখন প্রক্রিয়াকে সহজ ও ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে।

হ্যাডেন (E. H. Hadden) শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞান শিক্ষার সেই বিভাগ হিসেবে পরিগণিত করেছেন যার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক মূলত শিখনের সহায়ক কৌশল, বার্তা যা শিখনকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে তা নিয়ে আলোচনা করে থাকে। (Educational Technology is that branch of educational theory and practice which concerned primarily with the design and use of message which control the learning process.

ডেভিস (I. K. Davis, 1971) বলেছেন শিক্ষা প্রযুক্তি একদিকে যেমন শিক্ষা ও শিক্ষণের সমস্যাগুলি নিয়ে ভাবে, অন্যদিকে আবার শিখনের সহায়ক উপকরণকে সংগঠিত ও শৃঙ্খলিত করায় নিয়োজিত থাকে। (Educational Technology is concerned with the problems of education and training and is characterised by a disciplined and systematic approach to organisation of resources for learning.

নিকসন (M. Nickson, 1971) এর মতে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের শিক্ষার চাহিদা পরিতৃপ্তির লক্ষ্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জ্ঞানের প্রয়োগই হল শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান (Educational Technology deals with the application of many fields of science to the educational needs of the individual as well as of society.)

গ্যানের (Robert M. Gagne) ধারণা অনুযায়ী শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান হল শিখন প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা ও তার মূল্যায়নের উদ্দেশ্য বিভিন্ন ধরনের কৌশলের সুসংবদ্ধ বিন্যাস ও উদ্ভাবন করা (Educational Technology can be understood as meaning the development of set a systematic techniques and accompanying practical knowledge for desering testing and operating schools as educational systems."

জাতীয় শিক্ষা প্রযুক্তি পর্ষদ-এর **(National council of Educational Technology)** মতে শিক্ষা প্রযুক্তি হল মানুষের শিখন প্রক্রিয়ার উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো, কৌশল, উপকরণ প্রস্তুত করা, প্রয়োগ করা, মূল্যায়ন করা। (Educational Technology is the development application and evaluation of system technique and aids to improve the process of human learning.")

অন্যদিকে UNESCO এর বিশেষজ্ঞদের মতে শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান হল মানুষের আচরণের সাথে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ একটি বিশেষ যোগাযোগ প্রক্রিয়া। এই যোগাযোগ প্রক্রিয়াতে বৈদ্যুতিক গণমাধ্যম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি সংগঠন (Association for Educational Communication

and Technology USA) বিভিন্ন মতামতকে একত্রিত করে শিক্ষা প্রযুক্তির একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান হচ্ছে মানুষ, ধারণা, কৌশল, পদ্ধতি ও সংগঠন এইসব নানা উপাদানের কার্যকরী সমন্বয়ে গঠিত এক সুসংহত জটিল প্রক্রিয়া যার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিখন সমস্যাকে বিশ্লেষণ করা, তার সমাধান খুঁজে বার করা ও তার ওপর মূল্যায়ন ও প্রয়োগ করা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধানের লক্ষ্যে এক যৌগিক প্রক্রিয়া। এই যৌগিক প্রক্রিয়া মুখ্য উপাদান হিসেবে মানুষ, শিক্ষার পদ্ধতি, ধারণা, কৌশল ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নানা ভাবে সহায়তা ও প্রভাবিত করে থাকে। এই উপাদান গুলির কার্যকরী সমন্বয় শিক্ষার উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

১.৪ ❑ শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের প্রকৃতি (The nature of Educational Technology)

শিক্ষা প্রযুক্তির সংজ্ঞাগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিভিন্ন চিন্তাবিদ্‌রা শিক্ষা প্রযুক্তির বিভিন্ন উপাদান ও তার বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপনা করেছেন। একদিকে যেমন মানব সম্পদ ও শেখানোর পদ্ধতির উপযুক্ততা ও প্রয়োগ নিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, তারই পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছে নানা শিক্ষণ উপকরণ, যন্ত্রাদি, গণমাধ্যম ও দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরণের কার্যকরী ব্যবহার ও যথার্থ উপস্থাপনার। পূর্ব আলোচ্য সংজ্ঞাগুলো থেকে শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের নানা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানা যায়। সেগুলি হল :

(১) শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক রীতিনীতির প্রয়োগ করা।

(২) শিক্ষণ-শিখন কে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের পরিমার্জন, পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটানো।

(৩) উপযুক্ত মাধ্যম ও পদ্ধতির নির্ধারণ করে শিখন প্রক্রিয়াকে সহজ ও ত্বরান্বিত করা।

(৪) শিক্ষার মূল লক্ষ্যকে চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে পঠন-পাঠনের উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করা।

(৫) শিখনের ফলশ্রুতি পরীক্ষা করা ও মূল্যায়ন করার জন্য বিভিন্ন কৌশলের নকশা করা ও তা প্রস্তুত করা।

(৬) শিক্ষার ইনপুট (Input), প্রক্রিয়া (Process) এবং ফলাফল (output) এই তিনটি স্তরের সাথেই শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান জড়িত।

(৭) শুধুমাত্র প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে আবদ্ধ না থেকে শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান শিক্ষার সামগ্রিক প্রক্রিয়া ও পরিস্থিতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

(৮) শিক্ষা ক্ষেত্রে সঠিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সাথে শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

(৯) শিক্ষাক্ষেত্রে পড়ুয়ার চাহিদা, ক্ষমতা ও প্রেরণাকে যেমন গুরুত্ব দেয় তেমনি শিক্ষকের সক্রিয় ভূমিকাকে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে।

(১০) শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান উপকরণ, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিকে আলাদা ভাবে না দেখে এদের সম্মিলিত প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দেয়।

পরিশেষে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে শিক্ষার মূল লক্ষ্যকে স্থির রেখে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়া যথার্থভাবে পরিচালিত করার উদ্দেশ্য—

- তথ্যপ্রচার
- ব্যক্তি ও শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষণকে স্থির করা
- রীতি-সম্মত প্রয়াসে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়া সঞ্চালিত করা।

১.৫ ❑ শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য (Objectives of Educational Technology)

১.৫.১ সাধারণ উদ্দেশ্য

শিক্ষা প্রযুক্তি বিদ্যার প্রধানত দুই ধরনের উদ্দেশ্য আছে, সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্য :

সাধারণ উদ্দেশ্য (General Objectives)

(১) সমাজের চাহিদা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী শিক্ষার মূল লক্ষ্যগুলি চিহ্নিতকরণ ও নির্ধারণ করা।

(২) শিক্ষার মূল লক্ষ্য, মূখ্য কর্মসূচী ও পরিকাঠামোকে নির্দেশ করা।

(৩) বিজ্ঞান, কলা ও মানবিক মূল্যবোধের কার্যকরী সমন্বয় ঘটিয়ে পাঠক্রম প্রস্তুত করা।

(৪) শিক্ষার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সম্পদ (মানব ও বস্তু) ও কর্মপদ্ধতি চিহ্নিত করা।

(৫) শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে সঠিক মডেল তৈরি করা।

(৬) শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধাগুলোকে শনাক্ত করা ও তা প্রতিরোধ করার উপায় নির্দেশ করা।

(৭) পড়ুয়াদের মধ্যে স্বয়ং শিখন ও স্বাধীন পাঠের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

(৮) অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় নিয়ে আসা।

(৯) সমাজের প্রত্যেকের জন্য শিক্ষা, বিশেষ করে সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া।

(১০) কার্যকরী শিক্ষা কর্মসূচী রূপান্তরিত করার পক্ষে সুসংবদ্ধ ভাবে (system approach) পরিকল্পনা, শিখন-শিক্ষা প্রক্রিয়া ও মূল্যায়নকে পরিচালিত করা।

(১১) শিক্ষা তত্ত্ব সম্প্রচার করা ও সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

(১২) উন্নতমানের উপকরণ সরবরাহ করে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা।

১.৫.২ বিশেষ উদ্দেশ্য (Specific Objective) অথবা শ্রেণি কক্ষের প্রেক্ষিতে শিক্ষা কর্মসূচীর লক্ষ্য (Objectives of educational Technology interms of Specific Classroom Teaching)

(১) শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীর প্রারম্ভিক জ্ঞানের স্তর, বৈশিষ্ট্য ও চাহিদাগুলিকে পর্যালোচনা করা ও চিহ্নিত করা।

(২) কোন শ্রেণিকক্ষের শিক্ষামূলক লক্ষ্যকে নির্ধারণ করা, তার পরিপ্রেক্ষিতে সেই শ্রেণির জ্ঞানমূলক, প্রক্ষোভ মূলক ও সঞ্চালন মূলক নিরুপণ করা।

(৩) শ্রেণি কক্ষের পাঠ্যক্রমে পাঠ্যসূচীর পাঠকে পর্যালোচনা করা ও তাদেরকে ক্রমানুযায়ী জ্ঞানের ধারণা ও পর্যায় অনুযায়ী সুবিন্যস্ত করা।

(৪) শ্রেণিকক্ষের পাঠক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে উপকরণ ও সম্পদ শনাক্ত করা ও ব্যবহার করা।

(৫) শ্রেণিকক্ষের শিক্ষক শিক্ষার্থী, উপকরণ, শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি, প্রতিন্যাস (Attitude), প্রতিসংকেত (Feed back), মূল্যায়নের নিরীখে উপযুক্ত মিথক্রিয়ার (Classroom interaction)চিহ্নিত ও সুপরিচালিত করা।

(৬) শিক্ষার্থীর সম্পাদিত কার্য ও আচরণের নমুনা অনুযায়ী শিখন-শিক্ষণ কর্মসূচীর মূল্যায়ন করা।

(৭) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক প্রতিসংকেত (Feed back) দানের মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা।

১.৬ ❑ শিক্ষা প্রযুক্তির পরিধি (Scope of Educational Technology)

শিক্ষা প্রযুক্তির মুল উদ্দেশ্য হল শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সহজ ও ত্বরান্বিত করা ও শিক্ষার মানোন্নয়ন করা। তাই শিক্ষা প্রযুক্তির পরিসর সুবিশাল।

এই শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান একদিকে যেমন মূর্ত শিক্ষা পরিকাঠামোতে (Formal system) যুক্ত ; তেমনি এর কার্যকারিতা বিমূর্ত শিক্ষা পরিকাঠামোতে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

শিক্ষা প্রযুক্তির পরিসর সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে জেনে নিতে হবে কি প্রসঙ্গে এই শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সংজ্ঞাকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে শিক্ষাপ্রযুক্তির একদিকে যেমন ব্যক্তি ও শিক্ষা কার্যক্রমের প্রয়োজন অনুসারে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করে তেমনি বিজ্ঞানভিত্তিক ও রীতিসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষে তথ্য সম্প্রসারণ, শিক্ষণ নানা উপকরণ ও সম্পদের সনাক্তকরণ ও ব্যবহারের দিকে নজর দিয়ে থাকে।তাই দেশে শিক্ষার প্রসার ও গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান প্রায় সর্বস্তরের শিক্ষা ও পঠন-পাঠন প্রক্রিয়াকে প্রত্যাশা ও চাহিদা মাফিক পরিচালনা করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান সাধারণ ভাবে তিনটি পরিসরের কথা বলেছে। যথা,

(১) শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে নির্দেশদান প্রক্রিয়া পরিচালনা করা।

(২) শিক্ষামূলক প্রশাসন ও পরিচালনা ব্যবস্থাপনার প্রাসঙ্গিক প্রযুক্তি বিজ্ঞান।

(৩) শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রযুক্তি বিজ্ঞান।

রাওন্ত্রা (Rowntra, 1973) শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ছয়টি বিশেষ পরিসরের কথা বলেছেন। সেগুলি নিম্নরূপ

(১) শিখনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা

(২) শিখনের পরিবেশ পরিকল্পনা করা

(৩) সঠিকভাবে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা করা

(৪) যথাযথ শিক্ষণ পদ্ধতি ও মাধ্যম নির্ধারণ করা

(৫) শিখনের মুল্যায়ন করা

(৬) মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষণ শিক্ষা প্রক্রিয়াকে কার্যকর করা।

এই মর্মে আগরওয়াল (Aggarwal, 1995) শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের পরিসর হিসেবে আরো কয়েকটি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। উপরোক্ত বিষয়ের সাথে সাথে শিক্ষাপ্রযুক্তি বিজ্ঞান বিশেষ ভাবে সূচীবদ্ধ শিখন, শিখনের মডেল, শিখনের তত্ত্ব, বহুধা মাধ্যম দৃষ্টিভঙ্গী (Multimedia approach) ম্যাথেম্যাটিক্স সাইবার নেটিকস্, সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গী, মুক্তশিক্ষা, দূরশিক্ষা, মডিউলস্, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় জড়িয়ে চলেছে।

এই সমস্ত বিভিন্ন দিক গুলোর সাথে শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অন্যতম বিশেষ পরিসর হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিশ্বায়ন, দ্রুতপ্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও আর্থসামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সামাজিক উন্নয়ন ও গুণগত মান বৃদ্ধি করা।

১.৭ ❑ শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Educational Technology)

শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান সমস্যা দেখা যায়। এই সমস্যাগুলি হচ্ছে—

(১) শিক্ষা কেন্দ্রে বা বিদ্যালয় গুলিতে অনেক সময় উপযুক্ত ও দক্ষ শিক্ষকের অভাব।

(২) নানা কারণে শিক্ষা প্রযুক্তির অপব্যবহার।

এই সব কারণে শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে ব্যহত করে অথবা মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

শিক্ষা প্রযুক্তির সঠিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষার জ্ঞান, প্রক্ষোভমূলক ও সঞ্চালন মূলক লক্ষ্যের সাথে মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সুসংহত মিথস্ক্রিয়া ঘটানো। এই মেলবন্ধন বা মিথস্ক্রিয়া অনেক সময়ই অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই শিক্ষা প্রযুক্তির ব্যবহার অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

শিক্ষা প্রযুক্তির ব্যবহারের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে একে কি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা হচ্ছে। অনেক সময় শিক্ষা প্রযুক্তির ব্যবহার শুধুমাত্র দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির উপর ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। অর্থাৎ এখানে উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষা প্রযুক্তির ধারণাকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার কখনো শিক্ষা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার উন্নয়নের কৌশল হিসেবে শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানকে গণ্য করা হয়। উপযুক্ত কৌশল শিক্ষার তাৎক্ষণিক লক্ষ্যে পৌছতে সহজ করে তোলে। তবে এই প্রতিক্রিয়া কার্যকরী

করার জন্য চাই শিক্ষকের অন্তর্দৃষ্টি ও উপযুক্ত শিক্ষণ ক্ষমতা ও শিখনের পরিবেশ। এই তিনটি উপাদান একে অন্যের পরিপূরক হয়ে শিক্ষা কর্মসূচী সম্পন্ন করে। এদের মধ্যে কোন একটির অভাব হলে প্রত্যাশা মাফিক শিক্ষার ফললাভ হওয়া সম্ভব নয়।

১.৮ ❑ শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের উপাদান (Components of Educational Technology)

১.৮.১ হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার দৃষ্টিভঙ্গী (Hardware And Software Approach)

শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান পড়ুয়ার শিখন প্রক্রিয়ার উন্নয়নের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত সিস্টেম, কৌশল, সহায়ক উপকরণ তৈরি করা এবং এগুলির যথাযথ প্রয়োগ ও মুল্যায়ন করার দিকে মূলতঃ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাই শিক্ষাপ্রযুক্তি বিজ্ঞানকে দুটি প্রধান উপাদানে ভাগ করা যেতে পারে—

(১) শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সহজ ও উন্নতর করার জন্য শিক্ষা প্রযুক্তিকরণ (Technology of education) আর দ্বিতীয়টি

(২) শিক্ষা বিজ্ঞানে নানা প্রযুক্তির ব্যবহার প্রয়োগ (Technology in education)

এই প্রথম উপাদানের দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেকে Soft-ware সফটওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি বলে থাকেন। আর দ্বিতীয় উপাদানকে হার্ডওয়ার (Hardware) দৃষ্টিভঙ্গি বলে থাকেন।

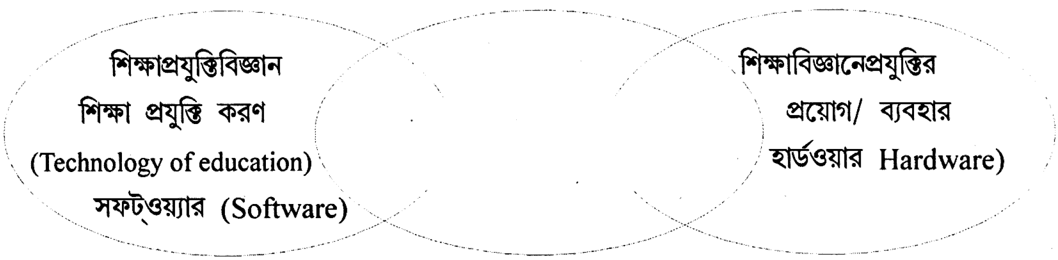

চিত্র : ১.১ শিক্ষাপ্রযুক্তি বিজ্ঞানে হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার দৃষ্টিভঙ্গী

উপরোক্ত চিত্রে ১.১ শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ী ধারণাকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

১.৮.২ সফটওয়ার দৃষ্টিভঙ্গী (Software Approach)

ব্যক্তিকে যথাযথ প্রক্রিয়া ও পরিবেশের মাধ্যমে জীবন পথে এগিয়ে নিয়ে চলা অথবা জীবনোপযোগী কৌশল ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করাই হল শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বিশেষ লক্ষ্য। ব্যপক অর্থে শিক্ষার্থীর মধ্যেকার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বা শক্তিকে যথাযথভাবে প্রকাশ করার কাজই হল শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের। ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজজীবনের চলার পথে মানুষ নানাভাবে অভিজ্ঞতা বা কৌশল আয়ত্ত করে থাকে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নিজের ক্ষমতা, চাহিদা, প্রেষণা ইত্যাদির সাথে পড়ুয়াকে তার পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক চাহিদার

প্রেক্ষাপটে নানাভাবে আচরণের পরিবর্তন ঘটাতে হয়।

'শিক্ষা বিজ্ঞানে প্রযুক্তিকরণ' বা **সফটওয়ার** দৃষ্টিভঙ্গীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর চাহিদা, ক্ষমতা ইত্যাদির সাথে ভারসাম্য রেখে তার কার্য্যদক্ষতা অর্জন ও অভিজ্ঞতা লাভে সহায়তা করা, সেই অভিজ্ঞতা লাভের পরিবেশ প্রস্তুত করা। এই সফট্ওয়ার শিক্ষণ প্রযুক্তি বিদ্যা মূলত মনোবিদ্যা (Psychology) ও সমাজবিদ্যার (Sociology) বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ প্রযুক্তির প্রকৃত (Characteristics) অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নমনীয় (Soft)।

সফট্ওয়্যার দৃষ্টিভঙ্গী মনোবিজ্ঞানের আচরণ তত্ত্ব, শিখন তত্ত্ব, শিক্ষণতত্ত্ব ইত্যাদির প্রভাবে প্রভাবিত। আর্থার মেলটন (Arthar Melton, 1954)-এর মতে শিক্ষা বিজ্ঞানের প্রযুক্তিকরণ বা সফট্ওয়্যার দৃষ্টিভঙ্গী সরাসরি মনোবিজ্ঞানের সাথে যুক্ত। এই প্রযুক্তিবিদ্যা অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি হিসেবে আচরণের পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে।

এই সফট্ওয়্যার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজকর্ম মূলতঃ স্কিনার ও অন্যান্য আচরণ বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে শুরু হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে স্কিনারের আধুনিক প্রোগ্রাম শিক্ষণ, অবিরাম মূল্যায়ন ইত্যাদির ধারণা। শিক্ষায় **সফট্ওয়্যার দৃষ্টি ভঙ্গী** বা শিক্ষা প্রযুক্তিকরণের লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষণ-শিক্ষা প্রক্রিয়ার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে শিক্ষণ ও শিখন শর্তের উপর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ। এই মর্মে ডেভিস (Davis, 1971) বলেছেন আধুনিক কালের সূচীবন্ধ শিখন, টাস্ক অ্যানালিস্ মূল্যায়ন, প্রতিসংকেত, অবিরাম মূল্যায়ন ইত্যাদি সবই সফট্ওয়্যার দৃষ্টিভঙ্গীর আওতায় পড়ে।

অনেক সময় সফটওয়ার টেক্নোলজিকে নির্দেশদান প্রযুক্তিবিজ্ঞান, আচরণমূলক প্রযুক্তিবিজ্ঞান বা শিক্ষণ প্রযুক্তি বিজ্ঞান নামে অভিহিত করা হয়। সফটওয়্যার দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া বা উপকরণ প্রস্তুতি বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক রীতিনীতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

১.৮.৩ হার্ডওয়্যার দৃষ্টিভঙ্গী (Hardware Approach)

শিক্ষা হার্ডওয়্যার প্রযুক্তি বিজ্ঞান মূলত উপকরণের ব্যবহার ও প্রয়োগের ভিত্তিতে সূত্রপাত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তের সাথে সাথে বিবর্তন ঘটে শিক্ষার সহায়ক নানা উপকরণের ব্যবহার। আর তার ফলশ্রুতি হিসেবে উপজাত হয়েছে শিক্ষায় হার্ডওয়্যার দৃষ্টিভঙ্গীর।

হার্ডওয়্যার দৃষ্টিভঙ্গীতে শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে শ্রবণ ও দর্শক সহায়ক নানা উপকরণ—যেমন নানা যন্ত্রপাতি, ফিল্ম, প্রোজেক্টর, বেতার, টেপ রেকর্ড, টেলিভিশন, ভিডিও, কমপিউটার ইত্যাদি। এখানে শিক্ষা প্রযুক্তি মূলত যন্ত্রপাতির প্রস্তুতি ও ব্যবহারনীতিসমূহের উপর নজর দেয়। শিক্ষার হার্ডওয়্যার দৃষ্টিভঙ্গীর উপকরণ প্রস্তুতি ও ব্যবহারের ভিত্তিতে উপজাত হয়েছে। ডেভিসের (Davis, 1971) মতে হার্ডওয়্যার দৃষ্টিভঙ্গী ভৌতবিজ্ঞানের প্রয়োগ ও ব্যবহারিক দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই হার্ডওয়্যার দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে একই সাথে অধিক শিক্ষার্থীকে দ্রুত শিক্ষা দেওয়া যায়। শুধু তাই নয় আধুনিক প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের সহায়তায় দূরবর্তী শিক্ষা কার্যক্রমও দ্রুত দেশে গড়ে উঠেছে।

১.৯ ❑ শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান ও নির্দেশদান প্রযুক্তি বিজ্ঞান (Educational Technology and Instructional Technology)

নির্দেশদান প্রযুক্তি বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষণকে কার্যকর করার লক্ষ্যে উপযুক্ত উদ্দীপক নির্বাচন করা ও তা প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার্থীকে সরবরাহ করা যাতে তার মধ্যে প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া সংগঠিত করে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তনে সাহায্য করে।

নির্দেশদান প্রযুক্তিবিজ্ঞান হচ্ছে শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অংশবিশেষ।

নির্দেশদান প্রযুক্তি বিজ্ঞান সাধারণ নির্দেশদান সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান বহুমুখী সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধান নিয়ে জড়িত থাকে। শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান একই সাথে পরিকল্পনা, পরিকাঠামো, পাঠ, উপকরণ, পদ্ধতি, মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ের সাথে যুক্ত বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি, মানবসম্পদ ও বস্তুসম্পদ, পরিচালন ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত।

নির্দেশ দান প্রযুক্তি বিজ্ঞান পাঠক্রমের কোন নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে ছাত্রদেরকে সাহায্য করে। আর শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞান একই সাথে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়কে সাহায্য করে।

নির্দেশদান ও শিক্ষাপ্রযুক্তির তুলনামূলক আলোচনা নীচে করা হল :

শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান	নির্দেশদান প্রযুক্তি বিজ্ঞান
১। এর পরিধি অনেক বিস্তৃত। নির্দেশদান এর অংশ বিশেষ।	এর পরিধি শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের তুলনায় সীমিত।
২। জাতীয় শিক্ষানীতির নিরিখে এর লক্ষ্য নির্ধারিত হয়।	স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী এর লক্ষ্য স্থির হয়।
৩। জাতীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে এখানে শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তনের লক্ষ্য স্থির হয়।	শিক্ষার্থীর চাহিদা মাফিক এখানে আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্য স্থির হয়।
৪। সারা দেশের শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে শিক্ষাগত দক্ষতা ও যোগ্যতা আবিষ্কারের চেষ্টা চালানো হয়।	স্থানীয় এলাকার শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে দক্ষতা ও যোগ্যতার আবিষ্কার হয়।
৫। একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা মাথা রেখে শিক্ষামূলক মাধ্যম স্থির হয়।	বিশেষ শ্রেণিকে একক ধরে শিক্ষামূলক মাধ্যম নির্বাচন করা হয়।
৬। শিক্ষন সামগ্রীর মূল্যায়ন জাতীয় স্তরে হয়।	স্থানীয় স্তরে মূল্যায়ন করা হয়।
৭। জাতীয় শিক্ষা কাঠামোর কথা ভেবে শিক্ষণ উপকরণ বিপুল পরিমাণে প্রস্তুত হয়।	স্থানীয় চাহিদার নিরিখে শিক্ষণ-উপকরণ সীমিত পরিমাণে প্রস্তুত হয়।

পরিশেষে বলা যেতে পারে শিক্ষার মানোন্নয়ন, প্রসারের উপযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের শুরু। এই শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে আধুনিক কৌশল ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করা। এর দুটি প্রধান উপাদান হল—(১) শিক্ষা প্রযুক্তি করণ বা সফটওয়্যার ধারণ বা (২) শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রয়োগ বা ব্যবহার। যাকে অনেক সময় হার্ডওয়্যার দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে মনে করা হয়।

শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান আজ সর্বজন সমাদৃত ও বহুল প্রচলিত ধারণা। এই প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সাহায্যে জাতীয় শিক্ষার মান উন্নয়নের পথ সহজ ও ত্বরান্বিত করা হয়েছে। এরই সাহায্যে শিক্ষার প্রসার দ্রুত করা সম্ভব হয়েছে। তার ফলপ্রসূ হিসেব আধুনিক কালে প্রতিটি শিক্ষা কর্মসূচী উপকরণের ও নানা প্রযুক্তির ব্যবহার অনেক বেড়ে গেছে।

১.১০ □ সারসংক্ষেপ (Summary)

শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সংজ্ঞা বিভিন্ন লেখক আলাদা ভাবে দিয়েছেন। এইসব সংজ্ঞায় শিক্ষার প্রায় সমস্ত দিকই কোন না কোন ভাবে স্থান পেয়েছে। শিক্ষার লক্ষ্য, তার জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, শিক্ষণের আধুনিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তির প্রয়োগ, শিখনের তত্ত্ব ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ এসবই স্থান পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধির মধ্যে সংজ্ঞায় উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলিই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সবিস্তারে বলা হয়েছে। শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সাহায্যে জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচির সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের ভবিষৎ বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং শ্রেণি কক্ষে উন্নতমানের পঠন পাঠন সম্পন্ন করা সহজ হয়েছে।

শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞানের দুই প্রকার উপাদান আছে। হার্ডওয়্যার দৃষ্টিভঙ্গী কথাটির অর্থ শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা প্রকার প্রযুক্তির ব্যবহার আর সফট্ওয়ার কথাটিতে বোঝায় শিখন প্রক্রিয়াকে সহজ করার জন্য যতদূর সম্ভব প্রযুক্তিকরণ। শিক্ষায় প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী হাত ধরাধরি করে চলে। এছাড়াও শিক্ষা প্রযুক্তির পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ অর্থে নির্দেশ দানের প্রযুক্তি যা শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ, শিক্ষা প্রযুক্তির উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করে।

১.১১ □ প্রশ্নাবলি (Questions)

১। (ক) শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের একটি সংজ্ঞা দিন।
(খ) শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য কী?
(গ) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাপ্রযুক্তির প্রয়োগের একটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করুন।
(ঘ) সফটওয়্যার উপাদান কী?
(ঙ) হার্ডওয়্যার উপাদান কাকে বলে?

২। (ক) শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ধারণাগত ভিত্তি বলতে আপনি কী বোঝেন?
(খ) শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের একটি উপযুক্ত সংজ্ঞা নির্ণয় করুন।
(গ) শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সাধারণ উদ্দেশ্যগুলি কী কী?
(ঘ) শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন।
(ঙ) নির্দেশদানের প্রযুক্তি কাকে বলে?

৩। (ক) শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও পরিধি আলোচনা করুন।
(খ) শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যগুলি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
(গ) শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের উপাদানগুলি ব্যাখ্যা করুন। শ্রেণি শিক্ষার ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব কী?
(ঘ) শিক্ষা প্রযুক্তি ও নির্দেশদান প্রযুক্তির তুলনামূলক আলোচনা করুন।

একক ২ ❑ নির্দেশদানের নক্‌শা ও সূচীবদ্ধ নিবিড় শিখন (Instructional designing and Programmed Learning)

গঠন (Structure)

২.১ সূচনা
২.২ উদ্দেশ্য
২.৩ নির্দেশদানের নক্‌শা
২.৩.১ নির্দেশদানের নক্‌শার ধারণা
২.৩.২ নির্দেশদানের নক্‌শার উদ্দেশ্য
২.৩.৩ নির্দেশদানের নক্‌শার উপাদান
২.৩.৪ নির্দেশদানের নক্‌শার প্রস্তুতির পর্ব
২.৪ সূচীবদ্ধ নিবিড় শিখন বা প্রোগ্রাম শিখন
২.৪.১ ধারণা
২.৪.২ সূচীবদ্ধ শিখনের মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব
২.৪.৩ সূচীবদ্ধ শিখনের সংজ্ঞা
২.৪.৪ সূচীবদ্ধ শিখনের প্রকার ভেদ
২.৪.৪.১ সরল সূচী বা রৈখিক প্রোগ্রাম
২.৪.৪.২ জটিল সূচী বা বিভাজিত কার্যক্রম
২.৪.৫ কম্পিউটার পরিচালিত নির্দেশদান
২.৫ শিক্ষার লক্ষ্যের শ্রেণি বিভাজন
২.৫.১ শিক্ষার লক্ষ্যের ধারণা
২.৫.২ শিক্ষার লক্ষ্যের শ্রেণি বিভাজন
২.৫.৩ জ্ঞানবর্গের লক্ষ্য সমূহ
২.৫.৪ প্রক্ষোভ বর্গের লক্ষ্য সমূহ
২.৫.৫ সঞ্চালন বর্গের লক্ষ্য সমূহ
২.৬ সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গী
২.৬.১ সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গীর ধারণাগত ভিত্তি
২.৬.২ সিস্টেমের সংজ্ঞা
২.৬.৩ সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য
২.৬.৪ নিবিড় শিক্ষণে প্রযুক্ত সিস্টেমের উপাদান ও প্রক্রিয়া
২.৬.৫ সিস্টেম পদ্ধতির সুবিধা
২.৭ সারসংক্ষেপ
২.৮ প্রশ্নাবলি

২.১ ❑ সূচনা (Introduction)

কোন শিক্ষা কার্যক্রমের সফলতা নির্ভর করে শিখনের বিষয়বস্তু কি বা কিভাবে পড়ানো হবে, ও মূল্যায়ন করা হবে ইত্যাদি বিষয়ের উপর। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য পঠন-পাঠন পরিচালনার সাথে বিষয়বস্তু নির্বাচন ও নির্দেশদানের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করা প্রয়োজন। নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে ছাত্রদের নির্দেশ দান বা শেখানো হলে কোন পাঠের শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত আচরণের পরিবর্তন সম্ভব যা পরোক্ষে শিক্ষার চরম লক্ষ্যে পৌছতে সাহায্য করে। শিক্ষর তাৎক্ষণিক ও চরম উদ্দেশ্য স্থির হবার পর উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীকে শিখনে অগ্রণী করা বা মূল্যায়নে প্রস্তুত করার প্রয়োজন। এর জন্য জরুরী হচ্ছে বিষয়বস্তু যুক্তিক্রম ও শিক্ষার্থীর প্রারম্ভিক জ্ঞান বা ক্ষমতা অনুযায়ী বিন্যস্ত করা। অর্থাৎ শিখনের নক্‌শা স্থির করা যাতে করে বিষয় বস্তুর সংকলন, প্রক্রিয়া করণ ও উপস্থাপনা শিক্ষার্থীকে তার কাম্য লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিখনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন, সামর্থ্য বা গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী ছোট ছোট অংশে সাজানো যাতে করে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখবে এবং তার স্বমূল্যায়ন তাকে পরবর্তী পর্যায়ে অগ্রসর হতে উৎসাহিত করবে। এই পাঠে তাই এইসব বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

২.২ ❑ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা

- নির্দেশদানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নির্দেশদানের লক্ষ্য, উপাদান, ও প্রস্তুতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- সূচীবদ্ধ শিখনের তত্ত্ব, সংজ্ঞা ও মুখ্যনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।
- সরল ও জটিল সূচীর ধারণা, সংজ্ঞা, সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষার লক্ষ্যের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।
- জ্ঞানবর্গ, প্রক্ষোভবর্গ ও সঞ্চালনবর্গের লক্ষ্যগুলি উল্লেখ করতে পারবেন
- সিস্টেম পদ্ধতির ধারণা, সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা-অসুবিধা বলতে পারবেন।

২.৩ ❑ নির্দেশদানের নকশা (Instructional design)

২.৩.১ নির্দেশ দানের নক্‌শার ধারণা (Concept of Instructional Design)

শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বাস্তবসম্মত প্রক্রিয়ার মূল চাবিকাঠি লুকিয়ে রয়েছে উপযুক্ত নির্দেশদান ও শিক্ষণ উপকরণের উপর। আসলে সঠিক নির্দেশদানের নক্‌শা ও উপকরণ সামগ্রীর প্রস্তুতির মাধ্যমে শিক্ষা প্রযুক্তির কার্যকরী রূপ দেওয়া সম্ভব। 'নির্দেশ দানের নক্‌শা' হচ্ছে মানুষের শিখনের সহায়ক পরিলেখ

(Schemanlizalian)। এই পরিলেখ বা নক্‌শার মুল বা প্রধান ধাপ হচ্ছে শিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য, শিক্ষণ পদ্ধতি, শিখনের কার্যক্রম, শিক্ষা কর্মসূচীর রূপায়ণ ও মূল্যায়ন মাপকাঠি ও পদ্ধতি নির্দেশিত বা উপস্থাপনা করা। নির্দেশদান নক্‌শার লক্ষ্য হচ্ছে উপযুক্ত শিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সহজ ও ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করা।

নির্দেশদান প্রক্রিয়াই শিক্ষণকে লালন পালন করে। আর এই নির্দেশদানই শিখনের কার্যকারিতা, দক্ষতা ও সর্বজনীন আবেদন বাড়াতে সাহায্য করে। নির্দেশদানের নক্‌শার ভিত্তি আবার শিখনের তত্ত্ব, পড়ুয়াদের মানসিক গঠন ও সামাজিক অবস্থা, প্রয়োজনীয় দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরণ, শিক্ষণের মাধ্যম ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সম্পর্ক যুক্ত।

নির্দেশদান সফল ও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কিছু নীতির কথা শিক্ষাবিদ্‌রা আলোকপাত করেছেন। সেগুলো হল—

- শিক্ষণে বিষয়বস্তুর সাধারণীকরণ, উপস্থাপনা করা ও প্রতিসংকেত সহ অনুশীলন করা।
- নির্দেশদানের নক্‌শাশিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানকে সক্রিয় করবে, নতুন জ্ঞানকে উপস্থাপিত করবে ও নতুন জ্ঞানের প্রয়োগ করার সুযোগ তৈরি করবে।

২.৩.২ নির্দেশদানের নক্‌শার উদ্দেশ্য (Aim of Instructional design)

- শিখনের মান উন্নয়ন ঘটানো
- শিক্ষার্থীর শিখনের প্রতি সন্তোষজনক মনোভাব তৈরি
- পঠনের সময় সীমা কমানো
- শিখনের উদ্দেশ্যে সঠিক যোগাযোগ ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা
- শিক্ষকের ভূমিকা অধিকতর সন্তোষজনক করা।

২.৩.৩ নির্দেশদানের নক্‌শার উপাদান (Components of Instructional Design)

নির্দেশদানের নক্‌শা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে যে উপাদান গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় সেগুলি হল— (Basic Consideration for instructional designing)

- পড়ুয়ার প্রকৃতি ও শিখনের ধরন বা শৈলী (style)
- শিখনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য
- শিখনের মাধ্যম,—(দৃশ্য, শ্রাব্য, কম্পিউটার ইত্যাদি)
- শিখনের পদ্ধতি—(ব্যক্তিকেন্দ্রিক, দলগত ইত্যাদি)

নির্দেশদানের নকশার কার্যকরী রূপ দেবার আগে একটি পরিকল্পনার প্রস্তুত করার কথা বলা হয়। একে অনেকে বলেন Specification Table. একে অনেক সময় স্পেসিফিকেশন ম্যাট্রিক্সও (Specification matrix) অনেকে বলে থাকেন। এই সারণি দ্বিমাত্রিক যার একদিকে পাঠের মূল বিষয়গুলিকে সহজ থেকে জটিল এই পর্যায়ক্রমে বিস্তার করা হয় আর অন্য পাশে পঠনের মাধ্যমে যে তিন প্রকার আচরণ অর্থাৎ প্রজ্ঞামূলক, প্রাক্ষোভিক ও সঞ্চালনমূলক আচরণ যা শিক্ষার্থীর লাভ করার কথা তা লেখা থাকবে।

নীচে স্পেসিফিকেশন টেবিলের নমুনা উপস্থাপন করা হল :

সারণি : ২.১ পাঠক্রম প্রস্তুতির স্পেসিফিকেশন টেবিল

কোর্সের নাম : জনসংখ্যা শিক্ষা

ক্রমঃ নং	পড়ুয়ার কাঙ্ক্ষিত আচরণ বা ক্ষমতা / বিষয়	জ্ঞানবর্গ			প্রক্ষোভ বর্গ	সঞ্চালন বর্গ	মোট পাঠ ও নির্দেশদান
		জ্ঞান	বোধ	প্রয়োগ			
১.	জনসংখ্যা বলতে কী বোঝায়	১	১				২
২.	জনসংখ্যা শিক্ষার ধারণা	১	১				২
৩.	জনসংখ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা	১	১		১		৩
৪.	জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ	১	১	১	১		৪
৫.	জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাপ	১	১	১			৩
৬.	জনসংখ্যা সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা	১	১	১	১	১	৫

২.৩.৪ নির্দেশদান নকশার প্রস্তুতির পর্ব (Steps for Preparation of Instructional design)

নির্দেশ মূলতঃ তিনটি স্তরের মাধ্যমে কার্যকরী করা হয়। **এগুলি হল—**

স্তর ১ : ধারণা সৃষ্টি করা এবং সৃজন মাত্রা নির্ধারণ করা।

স্তর ২ : শিখনের উপযুক্ত অভিজ্ঞতা সমূহের নকশা প্রস্তুত করা।

স্তর ৩ : বিষয়বস্তুর সংকলন, প্রক্রিয়াকরণ ও উপস্থাপন করা।

নির্দেশদান নকশার পরিকল্পনাকে অনেকে কোর্সওয়ার আবার অনেকে পাঠ্যসূচী হিসেবে মনে করে থাকেন। এই কোর্সওয়ার মূলতঃ কোন বিষয় ও সেই বিষয়ের অন্তর্গত পাঠমালা দ্বারা প্রস্তুত। এই নির্দিষ্ট পাঠে নানা অভিজ্ঞতা সহজ থেকে জটিল এই ক্রমান্বয়ে (জ্ঞানমূলক, প্রক্ষোভমূলক ও সঞ্চালনমূলক) সংকলিত করা হয়। যেমন ২.১ সারণিতে একটি পাঠের সাথে বহু অভিজ্ঞতার সংযোজন ও প্রক্রিয়াকরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। নির্দেশদান নকশার লক্ষ্য হচ্ছে খুব সহজ ও মনোগ্রাহী হিসেবে সেগুলিকে উপস্থাপন করা।

নির্দেশদান নক্‌শা হল যা শিক্ষক, পাঠক্রম বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্যরা সম্মিলিতভাবে এই কাজ করে থাকে। অনেকে একে সিস্টেম প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেন বা সংক্ষেপে এই নক্‌শা বা ডিজাইনকে ISD (Instructional System Design) বলে অভিহিত করে থাকে। এই সিস্টেম পদ্ধতিতে পারস্পরিক চক্রায়ন (Interactive Recycling) মুক্ত বার্তা প্রত্যাবর্তন (Feedback) ও তত্ত্ব সংকলনের উপর নির্ভর করে। এই সিস্টেম পদ্ধতির সোপান সমূহ হচ্ছে :—

(১) মুখ্য বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ।
(২) শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা ও সংজ্ঞাদান করা।
(৩) বিভিন্ন উপাদান গুলিকে শনাক্ত করা।
(৪) প্রয়োজনীয় উৎস ও প্রতিবন্ধকতা গুলিকে বিশ্লেষণ করা।
(৫) উপযুক্ত নির্দেশদানের বস্তু সামগ্রী তৈরি করা।
(৬) মূল্যায়নের নক্‌শা প্রস্তুত করা।
(৭) পরীক্ষামূলক বা Field testing এর ব্যবস্থা করা
(৮) পরীক্ষামূলক ফলাফল অনুযায়ী—সংশোধন, পরিমার্জন ও সংযোজন করা
(৯) সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করা
(১০) কার্যকরীভাবে নির্দেশদান নক্‌শা প্রতিস্থাপন করা।

উপযুক্ত নির্দেশদানের নক্‌শা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে যে যে বিষয়ে জোর দিতে হয় সেগুলি নিম্নরূপ :
(১) পড়ুয়ার মনোযোগ আকর্ষণ করা।
(২) শিক্ষার্থীকে নির্দেশদানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানানো।
(৩) প্রাথমিক ধারণা বা প্রারম্ভিক ধারণা গুলিকে সঞ্চারিত করা।
(৪) পঠনের উদ্দীপনা ও আগ্রহ সৃষ্টি করা।
(৫) শিখন মুলক নির্দেশ দান করা।
(৬) পারদর্শিতা উদ্রেক করা।
(৭) শিখন বা কাজের মূল্যায়ন করা।

এই নির্দেশদান নক্‌শার সফলতা নির্ভর করে সঠিক ও সুবিন্যস্ত ছোট ছোট শিক্ষণ অভিজ্ঞতার উপর। এই ধারণা থেকে প্রোগাম শিখন বা সূচীবন্ধ নিবিড় শিখন কর্মসূচীর শুরু হয়।

২.৪ ❑ সূচীবন্ধ নিবিড় শিক্ষণ বা প্রোগ্রাম শিখন (Progoammed learning)

২.৪.১ ধারণা (concept)

সকলের জন্য শিক্ষা আমাদের লক্ষ্য। দেশ ও জাতির উন্নয়নের লক্ষ্যে সবাই শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কৃষি, শিল্প, কারিগরী, প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষিত ও দক্ষ লোকের অভাবে আমরা এখনো আমাদের

অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারিনি। এই পথকে সহজ ও সুগম করার উদ্দেশ্যে নানান গবেষণা ও বিশ্লেষণ হয়েছে। এরই ফল হিসেবে কয়েকটি বিষয় জানা যায়। এগুলি হল—

(১) দেশের শিক্ষিত লোকের তুলনায় কলকারখানা বা শিল্পের বিকাশ তেমন হয়নি।
(২) প্রয়োজনের তুলনায় দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত—ব্যক্তির অভাব।
(৩) প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের অভাবে দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের মান নিম্নগামী।
(৪) হাতে কলমে অভ্যাস করার সুযোগ কম বা প্রশিক্ষণের সুযোগের অভাব।
(৫) বইপত্র অনেক ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে নির্দেশদান করতে পারে না।

এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে এমন একটি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়েছিল যাতে করে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই সহজে শিখতে পারে। এরই প্রেক্ষাপটে যে পদ্ধতির প্রকাশ ঘটে তা হল ব্যক্তি-ভিত্তিক সূচীবন্ধ নিবিড় শিক্ষণ বা Programmed Instruction।

শিক্ষা বিজ্ঞানে সূচীবন্ধ শিখন হল আচরণগত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সম্মিলিত প্রয়াস। প্রোগ্রাম শিখনে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন, সামর্থ্য এবং ক্ষমতা অনুযায়ী ছোট ছোট অংশ হিসেবে কোন একটি বিষয় বস্তু বা অভিজ্ঞতাগুলি বিভাজিত করে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করা হয়। এই সূচীবন্ধ নিবিড় শিখন বা প্রোগ্রাম শিখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিখন প্রক্রিয়া। এখানে শিখনের অভিজ্ঞতাগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত ও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সুবিন্যস্ত করা হয়। এখানে এই ছোট ছোট অভিজ্ঞতাগুলি সুসংবন্ধভাবে একে অন্যের পরিপূরক হয়ে শিক্ষার্থীকে কাম্য লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে।

আমরা জানি প্রত্যেকটি সূচীবন্ধ নিবিড় শিক্ষণই শিক্ষণ কিন্তু প্রত্যেকটি শিক্ষণ কিন্তু সূচীবন্ধ নিবিড় শিক্ষণ হতে পারে না। আসলে নির্দেশদানের একটি উপ একক হচ্ছে প্রোগ্রাম শিক্ষণ আর শিক্ষণের একটি উপএকক হচ্ছে নির্দেশ দান। পাশের চিত্রে শিক্ষণ, নির্দেশদান ও প্রোগ্রাম শিক্ষকের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

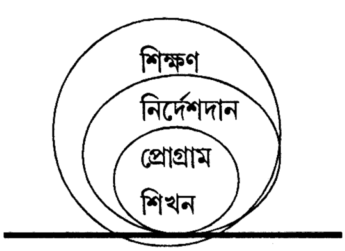

চিত্র ২.১ শিক্ষণ, নির্দেশদান ও প্রোগ্রাম শিক্ষণ

প্রোগ্রাম শিখন হচ্ছে নির্দেশদান এর একটি অংশ বিশেষ, সুচীবন্ধ নিবিড় শিক্ষণ বা প্রোগ্রাম শিখন হচ্ছে স্বঃপ্রশিক্ষণের স্বার্থে শিখনের অভিজ্ঞতা গুলোকে সাজানো।

২.৪.২ ❑ সূচীবদ্ধ শিখনের মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (Psychological theories of programmed instruction)

বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকান, শিক্ষাবিদ্ ই. এল. থর্নডাইক (১৮৭৪-১৯৪৯) এর ফল লাভ (Law of effect) সূত্র প্রোগ্রাম শিখন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিশেষ বিবর্তন আনে। থর্নডাইক এর মতে কোন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মানে যোগসূত্র 'ফল' দ্বারা নির্ধারিত হয়। ভাল ফল এবং পুরস্কার এই যোগসূত্রকে দৃঢ় করে। এ সূত্রটি প্রোগ্রাম শিখন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেয়। পরে এই প্রোগ্রাম শিখন/বা সূচীবদ্ধ শিখনের ক্ষেত্রে এম, এল প্রেসি, রবার্ট মেজার, গ্যানে, স্কিনার ও অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীদের চিন্তা ও মতবাদ বিশেষ গুরুত্ব পায়।

প্রেসির অবদান (Contribution of S.L. Pressey)

অহিও স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২০ তে এস. এল প্রেসী ড্রাম টিউটর নামে একটি শিক্ষা ও পরীক্ষার যন্ত্র তৈরি করে। এই যন্ত্রটি একের পর এক প্রশ্ন করে যতক্ষণ না শিক্ষার্থী সঠিক উত্তর দেয়। যখন শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট সফলতার মানে পৌঁছতে পারে তখন নিজে থেকেই যন্ত্রটি প্রশ্ন করা বন্ধ করে দেয়। প্রশ্ন তৈরি করার সময় একটি প্রশ্নের একাধিক বিকল্প উত্তর রাখা হয়। শিক্ষার্থীকে একটি বোতাম টিপে সঠিক উত্তর দিতে হয়। ধীরে ধীরে প্রতিটি পাঠ শেখা হলে যন্ত্রটি বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ এই যন্ত্রটির মাধ্যমে পড়ুয়ারা নিজে নিজে লিখতে ও শেষে তার মুল্যায়ন করতে পারে। একই সাথে শেখা ও মূল্যায়ন করা প্রোগ্রাম শিখনে একটি নতুন দিকের নির্দেশ দেয়।

রবার্ট মেগার (Robert Mager) (১৯৫৪) : সুনিয়ন্ত্রিত শিখন নামে একটি নতুন ধারণার. উল্লেখ করেন। তার মতে শিখনের সময় শিক্ষক যতটা সম্ভব নীরব থাকবেন। শিক্ষার্থী নিজে শিক্ষককে প্রশ্ন করে উদ্দীপিত করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রশ্ন ও প্রয়োজন অনুযায়ী উদাহরণ, প্রস্তাবনা, প্র্যাক্‌টিস করানো বা সাহায্য করবেন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও উদ্দীপনার নমুনা অনুযায়ী শিক্ষণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হবে। মেগারের মতে শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা ব্যবহার করে তাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করা।

রবার্ট, এম. গ্যানে (Robert M. Gane) : সূচীবদ্ধ শিখনের জন্য শিখন সম্পর্কিত ধারণার বিশ্লেষণ ও তার বিভিন্ন ধাপগুলি নিয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন। গ্যানে শিখনের শ্রেণি বিন্যাস সম্বন্ধে বলেছেন। 'উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া' থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে শৃঙ্খলয়িত শিখন, বাচনিক সংযোগ, পৃথকীকরণ, ধারণা (Concepts) ও নিয়ম, এইভাবে উচ্চতর শিখন প্রক্রিয়ার শ্রেণি বিভাগ করেছেন গ্যানে। সুচীবন্ধ শিখনের ক্ষেত্রে এই এককগুলির বিশ্লেষণ ও পর্যায়ক্রম স্থির করা হল শিক্ষকের কাজ।

বি, এফ, স্কিনারের ক্রিয়া সাপেক্ষ অনুবর্তন তত্ত্ব (B.F. Skinner theory of conditioning)

হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি শিক্ষার্থীর আচরণ কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাবে তার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শিখনের পরিবেশ সাধারণ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে Pavlov এর অনুবর্তন তত্ত্ব বা Classical Conditioning এবং স্কিনারের সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্ব ব্যবহৃত হয়। পরে

স্কিনারের মতবাদ প্রোগ্রাম শিখনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। স্কিনার তার সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্বে বলেছেন শিখনের ক্ষেত্রে প্রবলন সঞ্চারের কৌশলকে কার্যকরী করতে হলে তা বাইরের পুরস্কারের মাধ্যমে সব সময় করা যায় না। শিখনমূলক আচরণই মানুষের প্রবলন সঞ্চারের উৎস। কোন বিশেষ মুহূর্তের শিখনমূলক আচরণই প্রবলনের মূল উৎস হিসেবে কাজ করবে।

প্যাভলভের মতে প্রতিবর্ত হল (Classical conditioning) একটি অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া কতকগুলি ইচ্ছাধীন বা নির্দিষ্ট উদ্দীপক দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরে এই প্রতিবর্ত উদ্দীপকই আবার প্রতিবর্ত প্রক্রিয়াকে বা প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত বা উদ্দীপিত করে। বেশির ভাগ মনোবিজ্ঞানীরা মনে করতেন বহিঃস্থ উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতে কিছু অন্তঃস্থ উদ্দীপক প্রতিক্রিয়াগুলিকে আবার জাগিয়ে তোলে। প্যাভলভ প্রমাণ করেছিলেন যে প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ করে যতক্ষণ প্রতিবর্ত উদ্দীপকের সাথে অন্ততঃ মাঝে মাঝে কিছু স্বাভাবিক উদ্দীপকও থাকে। অন্যথা হলে প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। এই স্তরকে বলা হয় লোপ। আর প্রতিক্রিয়া মূলক আচরণ যা উদ্দীপকের সাথে মিলে মিশে থাকে তাকে বলা হয় উদ্দীপক জাতীয় অনুবর্তন।

স্কিনার 'উদ্দীপক না থাকলে প্রতিক্রিয়াও হবে না' এ ধরনের মতবাদ মেনে নিতে পারেন নি। স্কিনার প্রাধান্য দেন স্বতঃ ক্রিয়ামূলক আচরণের উপর, যা কোন নির্দিষ্ট উদ্দীপকের দ্বারা সৃষ্ট হয় না, কোন বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট। স্কিনার উদ্দীপক—প্রতিক্রিয়া (S-R) তত্ত্বের বদলে প্রতিক্রিয়া-উদ্দীপক (R-S) তত্ত্বের কথা বলেন। স্কিনারের মতে অনুবর্তন হল একটি আচরণ যা অভ্যাসগত ভাবে প্রাণী করে থাকে। যেমন—খাওয়া, জলপান করা ইত্যাদি। প্রাণীর কোন আচরণ যখন সন্তোষজনক ফল দেয় তখন সে আচরণটি সে বার বার সম্পাদন করার চেষ্টা করে। পঠনের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য এই যে শিক্ষার্থীর কোন উত্তর যদি শিক্ষক অনুমোদন করেন তবে এই উত্তরটি স্থায়ীভাবে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের অনুমোদনসূচক বাক্য বা ইঙ্গিত প্রবলক উদ্দীপক (Reinforcement) হিসেবে কাজ করে। শিখনের ক্ষেত্রে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার এই সম্পর্ক স্থাপনে শক্তিদায়ক উদ্দীপকের ভূমিকা এবং তারই ভিত্তিতে ধারাবাহিক আচরণ পরিবর্তন সাধন, স্কিনারের তত্ত্বের সবচেয়ে বড় অবদান। আর এই তত্ত্বের ভিত্তিতে সূচীবন্ধ নিবিড় শিখনের সূচনা হয়। এই শিখন পদ্ধতির কয়েকটি মৌলিক নীতি হল—

(১) একবারে একটি ধাপ শেখানো—আর একটি ধারণা শেখা হলে পরবর্তী ধারণায় অগ্রসর হওয়া

(২) শিক্ষার্থী নিজের গতি বা ক্ষমতা অনুযায়ী শিখবে।

(৩) শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে উত্তর দেবে।

(৪) প্রতিটি ধাপে প্রতি সংকেতের সুযোগ।

স্কিনারের এই নীতিগুলির প্রয়োগ নিবিড় সূচীবন্ধ শিখনের অপরিহার্য অঙ্গ।

ব্লুম (Bloom) এর তত্ত্ব

ব্লুম ও অন্যান্যরা সূচীবন্ধ নিবিড় শিখনের সময় শিক্ষামুলক উদ্দেশ্যাবলি ও সেই সক্রান্ত আচরণগুলি

নির্দিষ্ট করে দেওয়ার উপর জোর দিয়েছেন। এই কারণে নিবিড় শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষণের লক্ষ্যগুলিকে আচরণ হিসেবে চিহ্নিত করা যেমন—জ্ঞান, বোধ ইত্যাদির পরিবর্তে বলতে পারা, ইত্যাদি ভাষা ব্যবহার করার কথা বলা হয়। এই মর্মে পিটার পাইপ (Peter Pipe) সূচীবন্ধ নিবিড় শিখনের জন্য একটি কাঠামোর বর্ণনা করেছেন যা নিম্নরূপ :

নিবিড় শিখনের লক্ষ্য বা সাধারণ লক্ষ্য

↓

সূচীবন্ধ শিখনের উদ্দেশ্য বা অন্তিম লক্ষ্য

↓

উপাদান/বা অংশ বিশেষের আচরণ অন্তর্বর্তী আচরণ

↓

প্রয়োজনীয় প্রারম্ভিক দক্ষতা সমূহ

এখানে প্রারম্ভিক দক্ষতার অর্থ হল পড়ুয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা কতখানি তা ভাল করে প্রোগ্রাম প্রস্তুতির আগে জেনে নিতে হবে। এটাই হল প্রোগ্রামের ভিত্তি। অন্তিম লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর আচরণ কি হবে তা স্থির করা। এই দুই ক্ষেত্রে সঠিক মূল্যায়নের প্রয়োজন। মুল্যায়নের মাধ্যমে সূচীবন্ধ শিখনের সফলতা পরিমাপ করা যায়।

২.৪.৩ সূচীবন্ধ শিখন বা প্রোগ্রাম শিখনের সংজ্ঞা (Definitions of Programmed Learning)

এডগার ডেল (Edger Dale) এর মতে প্রোগ্রাম শিখন হয় কাম্য আচরণ লাভের উদ্দেশ্যে সুসংহত ও ধাপে ধাপে স্বয়ংসক্রিয় শিক্ষণ প্রক্রিয়া (Programmed Learning is a systematic step by step, self instructional Programme aimed to ensure the learning of stated behaviour)

ইপিচ ও উইলিয়ামের মতে (James E. Eipich and Bill William) : প্রোগ্রাম শিখন হচ্ছে সুপরিকল্পিত ভাবে বিন্যস্ত অভিজ্ঞতা যা শিখনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট দক্ষতা লাভে সাহায্য করে (Programmed Instruction is a planned sequence of experience, leading to proficiency interms of stimulus response relationship.)

কে. ও. মে (K.O. May, 1965) মনে করেন শিক্ষণের ক্ষেত্রে ছাত্রদের আচরণ সুসংগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করাই হচ্ছে শিক্ষণের প্রোগ্রামিং (Educational Learning is the scheduling and control of student behaviour in the learning process)

আর. সি. দাশ (R. C. Das, 1993) এর মতে প্রোগ্রাম শিখন এমন শিক্ষণ প্রক্রিয়া যেখানে শিক্ষার্থী স্বয়ং সক্রিয় হয়ে তার নিজের ক্ষমতা ও গতি অনুযায়ী শেখে। সুচীবন্ধ নিবিড় শিখনে বা প্রোগ্রাম শিখনে ধাপে ধাপে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা করা হয় যাতে করে শিক্ষার্থী সহজেই শিখতে পারে। (This is

a method of individualized instruction, where each individual learns by himself at his own rate, Programme learning consists of elements of new knowledge called 'steps' which are arranged in a sequence in such a way that a student can easily learn by himself.)

স্মিথ ও মুরের (Smith and Moore, 1962)মতে প্রোগ্রাম শিখন হচ্ছে শিখনের উদ্দেশ্যে বিষয় বস্তুকে ধাপে ধাপে সুবিন্যস্ত করা। সাধারণতঃ এখানে শিক্ষার্থীকে জানা ধারণার থেকে নতুন ও জটিল জ্ঞান, নীতি এবং বোধের দিকে অগ্রসর করা হয়।

উপরের সংজ্ঞাগুলিতে সূচীবন্ধ নিবিড় শিখনের নিম্নলিখিত গুণাবলী লক্ষ্য করা যায়—

(১) শিখনের সময় শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশ গ্রহণ।

(২) শিখন শিক্ষার্থীর নিজস্ব গুণাবলী অনুযায়ী হবে।

(৩) আন্তরিক ও আগ্রহ সহকারে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা লাভে নিযুক্ত করা।

(৪) শিখনের সাথে সাথে প্রাপ্ত জ্ঞানের মূল্যায়ন।

(৫) শিক্ষার্থী ও প্রোগ্রামের মধ্যে উপযুক্ত মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীর শিখনের উৎসাহ বা স্পৃহা বাড়ানো।

২.৪.৪ সূচীবন্ধ শিখনের প্রকারভেদ (Types of Programmed Learning)

সূচীবন্ধ নিবিড় শিখনকে দুভাগে ভাগ করা যায় :

(ক) সরলসূচী (Linear Programme)

(খ) জটিলসূচী (Branching Programme)

২.৪.৪.১ সরল সূচী বা রৈখিক প্রোগ্রাম :

ধারণা:—

সরল সূচীকে আমরা বলতে পারি সরল রৈখিক কার্যক্রম। স্কিনার ও তার সহকর্মীদের মতবাদের ভিত্তিতেই এই প্রোগ্রাম প্রথমে শুরু হয়। স্কিনারের মতে মানুষের শিখনের সময়ে প্রতিটি ধাপে যদি যথোপযুক্ত অভিজ্ঞতা বা পুরস্কার দিয়ে প্রবলিত বা প্রেষণা সঞ্চার করা যায় তাহলে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকে পরিচালিত করা সম্ভব। তাই শিখনের উদ্দেশ্যে আচরণকে পরিকল্পিত ভাবে বিন্যাস করা উচিত। তাই শিখনের ক্ষেত্রে সক্রিয় অনুবর্তনের প্রক্রিয়ার সাহায্যে শিক্ষার্থীর বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া ঘটানোর উপর স্কিনার গুরুত্ব দিয়েছেন। এই মতবাদের ভিত্তিতে রৈখিক প্রোগ্রামের নিম্নলিখিত নীতি তৈরি হল :

(১) ছোট ছোট ধাপের নীতি (Principle of small step))

(২) সক্রিয় প্রতিক্রিয়ার নীতি (Principle of active responding)

(৩) স্বল্প ভুলের নীতি (Principle of minimum errors)

(৪) ফলাফল জানার নীতি (Principle of knowledge of results))

এই প্রোগ্রামে সাধারণতঃ সরল রেখার গতিতে আচরণ গড়ে তোলা হয়। এখানে যতক্ষণ না একটি কাজ শেষ হয় ততক্ষণ সে অন্য কাজটির দিকে এগুতে পারে না। এখানে একটি মূল বিষয়কে ভেঙ্গে ছোট ছোট

অংশে ভাগ করা হয়। পরে সেই ছোট ছোট অংশ গুলিকে ধারাবাহিক ভাবে পরপর সরল থেকে জটিলতার ভিত্তিতে ক্রম বিন্যাস ঘটিয়ে ধারাবাহিক ভাবে সাজানো হয়। প্রত্যেক স্তরে খুব অল্প তথ্য থাকে। আর ছাত্রছাত্রীদের প্রতিক্রিয়া বা ফলাফল শীঘ্রই জানানো হয়। সরল সূচীতে/রৈখিক সূচীতে ছাত্রদের ধারাবাহিক ভাবে জ্ঞান আহরণ বা আচরণের পরিবর্তন ঘটানো হয়। এখানে চারপাশ থেকে আসা তথ্য বা বিশাল কোন বিষয়বস্তু একসাথে না শিখিয়ে অল্প অল্প বিষয়কে ছোট ছোট এককে ভাগ করে শিক্ষার্থীর জ্ঞান আহরণের জন্য ধারাবাহিক ভাবে অগ্রসরে সাহায্য করার দিকে জোর দেওয়া হয়।

সরলসূচী বা রৈখিক প্রোগ্রামের বৈশিষ্ট্য (Chracteristics of linear programming)

(১) সরলরৈখিক (Linear) গতিতে এখানে কার্যক্রম সংগঠিত করা হয়। ছোট ছোট ধাপে বা ৪০ বা ৫০টি কথার মধ্যে বিষয় ভেঙ্গে শিক্ষার্থীরা যাতে সহজে বুঝতে পারে ও শিখনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে তার উপর জোর দেওয়া হয়।

(২) বিষয় বস্তুর সরল রৈখিক বিন্যাস (Linear arrangement)

এখানে বিষয়বস্তু সাজানো বা বিন্যাস করা হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যৌক্তিক ক্রমান্বয়ে এবং সহজ থেকে কঠিন এই প্রগতিশীল ধারায়। বিষয়বস্তু সজ্জিত করার সময় নজর দেওয়া হয় যাতে শিক্ষার্থীর প্রাথমিক আচরণ থেকে অন্তিম আচরণ যেন সরল রৈখিক গতিতে পরিচালিত বা অগ্রসর হয়।

(৩) নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া (Controlled response) : এই প্রোগ্রাম রচনা করার সময় শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়ার বা প্রতিসংকেতের মান সুপরিকল্পিত ভাবে নির্দিষ্ট করা থাকে। তাই এখানে পাঠের অন্তর্গত প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করা থাকে।

(৪) প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব (Importance of response) : সরল সূচীতে শিক্ষার্থীকে অবিরত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর সক্রিয় ভাবে করতে করতে এগিয়ে যেতে হয়। এই সক্রিয় উত্তরদান নিজ শিখনের জন্য অবিরাম শক্তি সঞ্চার, মনোযোগ সঞ্চারে সাহায্য করে। তাই শিক্ষার্থীর প্রতিসংকেতের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(৫) তাৎক্ষণিক প্রতিসংকেত (Immediate feedback) রৈখিক/সরলসূচীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষার্থীরা তাৎক্ষণিক প্রতিসংবেত দেবে। কোন একটি ফ্রেমের উপর ভিত্তি করে শিখনের কাজ শেষ হলে সঙ্গো সঙ্গো শিখনের প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ার সাথে সম্পাদিত কাজের তুলনা করে ফলাফল জানানো হয়।

(৬) চুম্বক সূত্রের ব্যবস্থা (Provision for promt) প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীকে সহজ কোনো বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে করে শিক্ষার্থী সহজে শিক্ষণীয় বিষয়ের ইঙ্গিত পেতে পারে। প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও ঠিক ঠিক প্রতিক্রিয়া ইঙ্গিত চুম্বক সূত্র আকারে দেওয়া হয় প্রয়োজন বোধে।

(৭) সঠিক উত্তর আগে থেকে জানানো হয় না কারণ এতে শিক্ষার্থী অসাধু উপায়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে সমর্থ হতে পারে।

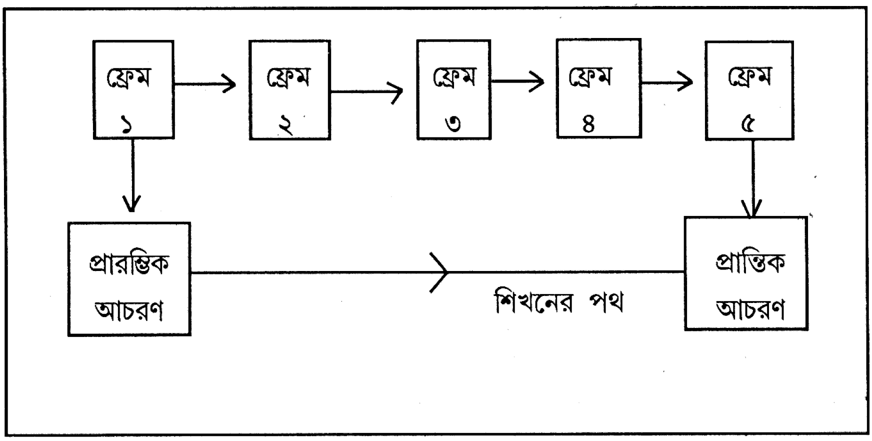

২.২ সরল সূচীর ফ্রেমের বিন্যাস

(৮) প্রতিটি ফ্রেম একক এবং ধারণা বিশিষ্ট।

(৯) প্রস্তুতি পর্বে ফ্রেমগুলিতে চুম্বক সূত্র দেওয়া হয় যাতে করে পরবর্তী পর্যায়ে ভুল কম হয়। অবশ্য পরের দিকে চুম্বক সূত্রের প্রয়োগ আর করা হয় না।

(১০) শিক্ষার্থীরা যাতে নিজে নিজে প্রতিক্রিয়া সংগঠিত করতে পারে তার উপর জোর দেওয়া হয়।

(১১) শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ গতিতে কাজ করলেও ফ্রেমগুলির ক্রম পর্যায় সকলের জন্য একই থাকে।

(১২) রৈখিক প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীর ভুল করার সম্ভাবনা কম। তাছাড়া ভুল কমানোর জন্য সহায়ক উদ্দীপক প্রম্পট করে ভুল কমানোর জন্য শিক্ষার্থীকে মনোযোগী করা হয়।

সরল সূচীর সীমাবদ্ধতা (Limitations of linear Programming)

(১) সরলসূচী অনেক সময় শিক্ষার্থীর কাছে একঘেয়ে ও বিরক্তিকর হয়ে ওঠে নিম্নলিখিত কারণে

(ক) কোন বিষয়কে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করায় তার সামগ্রিক রূপ অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা বুঝে উঠতে সময় নেয়।

(খ) এখানে শিখনের প্রক্রিয়া যান্ত্রিক এবং নিয়ন্ত্রিত।

(গ) শিখন প্রক্রিয়ার গতি অত্যন্ত ধীর।

(২) সরল সূচী শুধুমাত্র কয়েকটিমাত্র বিষয়বস্তু নিয়ে করা যায়। শিখনের সব ধরনের বিষয়বস্তুতে এর প্রয়োগ সম্ভব নয়। তাই এর ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

(৩) সরলসূচী শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি, বিচারশক্তি ও সৃজনশক্তি বিকাশকে বহুলাংশে সীমিত ও প্রতিহত করে দেয়। প্রতিসংকেত দেখে ছাত্রদের ক্ষমতাকে সঠিক ভাবে বিচার করা যায় না। তাই পড়ুয়াদের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হয় না।

(৪) পর্যায়ক্রমের ঋজুতা—শিক্ষার্থী নিজে কোন সমাধান তৈরি করার সুযোগ পায় না। তাকে কেবল মাত্র সূচী নির্মাতার লাইনগুলি পড়ে যেতে হয়।

(৫) এখানে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহের সুযোগ কম। যা পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে সম্ভব।

(৬) অনেক সময় শিক্ষার্থীরা অনুমানের ভিত্তিতে অগ্রসর হয়। ফলে তারা সঠিক শিখেছে কিনা বোঝা যায় না।

(৭) এখানে অল্প তথ্য বা জ্ঞান লাভে প্রচুর সময় ব্যয় হয়।

(৮) সরলসূচী কার্যক্রম একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া।

● **সরল সূচী কার্যক্রমের ব্যবহার (Utility of Linear Programming) :**

সরলসূচী কার্যক্রম নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সাধারণত: ব্যবহৃত হয়ে থাকে—

(১) বিশাল কোন বিষয়বস্তু যখন শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে না তখন সরল সূচীর মাধ্যমে ছোট ছোট অংশে বিষয়বস্তু ভাগ করে নিয়ে শেখালে শিক্ষার্থীর শিখনের সুবিধে হয়।

(২) শিক্ষার্থীদের একই ধরনের সক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা থাকে।

২.৪.৪.২ জটিল সূচী বা বিভাজিত কার্যক্রম (Branching Programme) :

ধারণা (Concept)

বিভাজিত বা জটিলসূচী প্রোগ্রামের প্রবর্তক হলেন নর্মান ক্রোডার (Norman Crowder)। তাই এর অন্য নাম হল Crowder Model। এই ধরনের প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীর নিজস্ব ক্ষমতা ও চাহিদা অনুযায়ী আচরণের পরিবর্তন ঘটে। এটি এমন একটি প্রোগ্রাম যেখানে কোন বাহ্যিক উপকরণ ছাড়াই শিখন সূচীকে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী সামঞ্জস্য পূর্ণ করা যায়। এটিকে অনেকে অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি বলে মনে করে থাকেন। কারণ এখানে শিক্ষার্থী নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিক্রিয়ার সামঞ্জস্য বিধান করে থাকেন। এখানে শিক্ষার্থী মূল ফ্রেমে সঠিক প্রতিক্রিয়া করলে, তবেই সে অন্য ফ্রেমে অগ্রসর হতে পারে। এখানে একাধিক সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া প্যাটার্ন দেওয়া থাকে। যদি শিক্ষার্থী কোন একটি ফ্রেমে ভুল প্রতিক্রিয়া করে থাকে তাহলে ভুলের প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাজিত শাখায় অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পায়। নীচে জটিলসূচী বা বিভাজিত প্রোগ্রামের চিত্র দেওয়া হল।

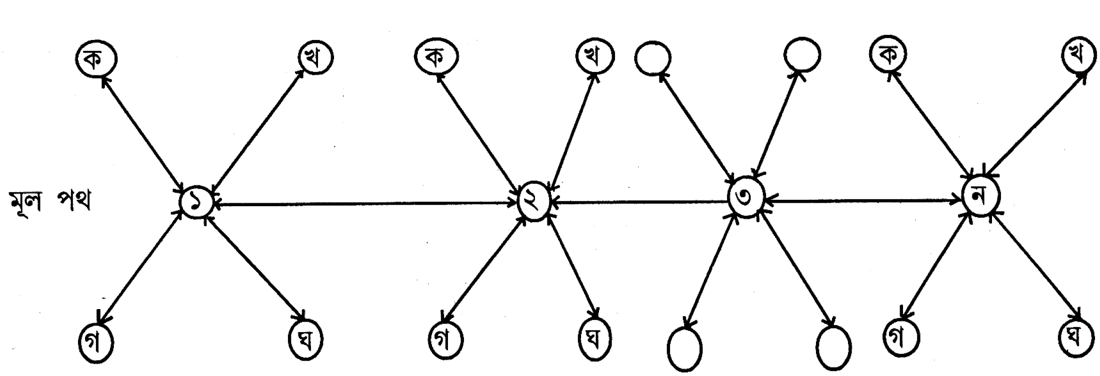

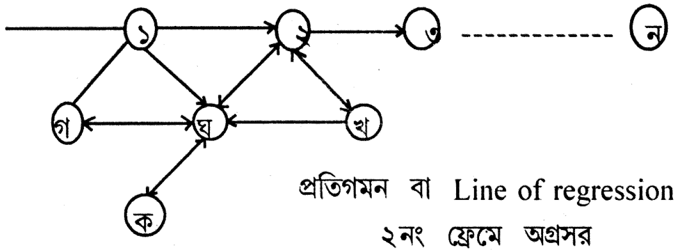

চিত্র—২.৩ সূচীর মুল পথ ও বিভাজিত প্রোগ্রাম সূচী

এই ধরনের প্রোগ্রামে বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে একই সাথে উপস্থাপিত করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা বিষয়ের সামগ্রিক ধারণা সহজে লাভ করে।

বিভাজিত প্রোগ্রাম আবার দুরকমের হতে পারে—

(ক) **পশ্চাদবর্তী বিভাজন (Backward Branching)**-এই প্রোগ্রামে নিখোঁজ ফ্রেমের পুনরাবৃত্তি করা হয়। শিক্ষার্থী সঠিক উত্তর দিলে ১নং ফ্রেম থেকে পরবর্তী ফ্রেম '২' তে চলে যায়। কিন্তু ভুল করলে তাকে তখন সংশোধন মূলক ফ্রেমে যেতে হয়। এখানে ধারণাকে উপলব্ধি করার জন্য যুক্তি ও বিষয়বস্তু সরবরাহ করা হয় যাতে শিক্ষার্থী সঠিক উত্তর দিতে পারে। তারপর তাকে আবার '১' ফ্রেমে গিয়ে সঠিক উত্তর দিয়ে '২' ফ্রেমে অগ্রসর হতে হয়। তাই যে শিক্ষার্থী প্রথমে ভুল করে তাকে একই ফ্রেমে দুবার যেতে হয়—

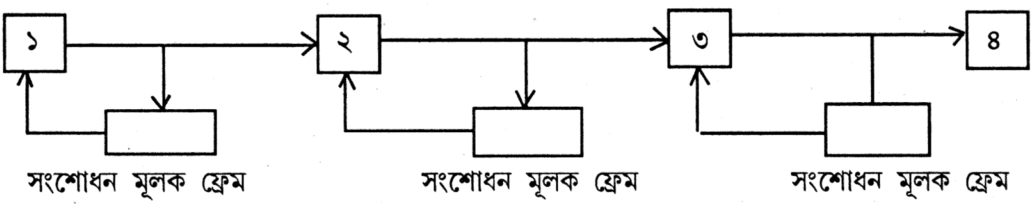

চিত্র—২.৪—পশ্চাদ্‌বর্তী শাখা বিভাজন

(খ) অগ্রবর্তী শাখা বিভাজন (Forward Branching)

এই ধরনের বিভাজনে শিক্ষার্থী ভুল বা সঠিক যাই করুক না কেন সর্বদাই এগিয়ে যাবে। শিক্ষার্থী সঠিক উত্তর দিতে পারলে পরবর্তী ফ্রেমে সরাসরি চলে যায়। আর ভুল করলে সংশোধন মুলক ফ্রেমে যেতে হবে।

এই স্তরে শিক্ষার্থীর ভুলটি ভালভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। তাকে ফের সম্ভাব্য প্রশ্ন দেওয়া হবে। সে যখন সঠিক উত্তর দেবে তখন পরবর্তী ফ্রেমে যাবে। কিন্তু তাকে আর মুল ফ্রেমে ফিরতে হয় না, সংশোধনের ফ্রেমের মাধ্যমে পরবর্তী ফ্রেমে এগিয়ে যেতে পারে। নীচে অগ্রবর্তী শাখা বিভাজনের নমুনা দেখানো হল।

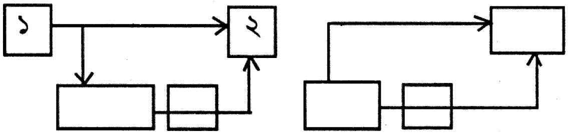

সংশোধন ফ্রেম

চিত্র—২.৫—অগ্রবর্তী বিভাজন

- জটিলসূচীর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Branching Programme)

(১) এখানে একই সাথে দু-তিনটি বিষয়বস্তুর ধারণা দেওয়া হয়। অর্থাৎ একাধিক ধারণা উপস্থাপিত করা হয়।

(২) প্রতিটি ফ্রেমে অনেক বেশি তথ্য থাকে। তাই একটি ফ্রেমের ধারণা অনেক বিস্তৃত হয়। কখনও দু-তিনটি অনুচ্ছেদে বিস্তৃত থাকে।

(৩) প্রশ্নের উত্তর নির্বাচন করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে একটি ধারণার সাথে অন্য ধারণার সম্পর্ক নিয়ে উত্তর দিতে হয়। তাই সে তার নিজের ক্ষমতা ও অগ্রগতিকে কাজে লাগিয়ে নিজস্ব উত্তর নির্বাচন করে।

(৪) শিক্ষার্থী ভুল উত্তর করলে তাকে সংশোধন করার সুযোগ দেওয়া হয়। অথবা ভুলের ব্যাখ্যা তাকে দিয়ে দেওয়া হয়।

(৫) শিক্ষার্থী এখানে নিজের পছন্দমত বিষয়বস্তু বেছে নিতে পারে।

(৬) শিক্ষার্থী বিভাজিত প্রোগ্রামে যে কোন পথ ধরে ধারাবাহিক ভাবে এগিয়ে যায়। শিখনের অগ্রগতি কখনো ব্যাহত হয় না।

(৭) শাখা বিভাজিত প্রোগ্রামে একাধিক প্রতিক্রিয়া করার সুযোগ থাকে।

(৮) শাখা বিভাজিত প্রোগ্রামে সকল শিক্ষার্থী একপথ অনুসরণ করে না। নিজস্ব ক্ষমতা ও ধারণা অনুযায়ী শিখনের পথ পরিবর্তিত হয়।

জটিল সূচী প্রোগ্রামের সুবিধা (Advantages of Branching Programme)

(১) একটি ফ্রেমের দৈর্ঘ্য বিস্তৃত হওয়ায় একই বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তির দরকার হয় না।

(২) এই ধরনের প্রোগ্রামে সংশোধন ফ্রেমে শিক্ষার্থীর ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি ব্যাখ্যা করা হয়। তাই এই প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী শুধু সঠিক উত্তর শেখার সাথে সাথে বুঝতে পারে কেন ভুল করেছে।

(৩) শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা অনুযায়ী পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে এই প্রোগ্রাম উপযোগী।

(৪) শিক্ষার্থী তার ক্ষমতা ও মনোযোগ অনুযায়ী শিখন পথ স্বাধীনভাবে নির্বাচন করার সুযোগ পায়।

জটিল সূচী বা বিভাজিত প্রোগ্রামের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Branching Programme)

(১) শিক্ষার্থী অনেক সময় বিষয়বস্তু সঠিক ভাবে না বুঝলেও আন্দাজ করে উত্তর দিতে সমর্থ হয়। তাই শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু সঠিক উপলব্ধি করল কিনা তা বোঝা যায় না।

(২) সকলের পছন্দ ও ক্ষমতা অনুযায়ী ফ্রেম, বিশেষ করে সংশোধন ফ্রেম প্রস্তুত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ।

(৩) কার্যক্রম তৈরি করার খরচ অনেক বেশি।

(৪) প্রয়োজন অনুসারে কার্যক্রম সংশোধন, পুনর্সংস্করণ ও পরিমার্জন করা উচিত যা খুব ব্যয় সাপেক্ষ।

(৫) খুব ছোট বাচ্চারা এই প্রোগ্রাম সঠিক ভাবে বুঝতে পারে না। তাই এই প্রোগ্রাম ক্লাস VI বা তার উপরের শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োগ করা যায়। সকল স্তরের শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেই এই প্রোগ্রামের প্রয়োগ সম্ভব নয়।

(৬) এই প্রোগ্রামে বিষয়বস্তু অনেক বড় থাকে বলে অনেক সময় সমস্ত বিষয়ের উপর প্রশ্ন করা সম্ভব হয় না।

(৭) এই প্রোগ্রামে স্বাধীনতা বেশি দেওয়া হয় বলে শিক্ষার্থীদের শিখনের 'সময় কাল' নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়না। যা প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করে।

২.৪.৫ কম্পিউটার পরিচালিত নির্দেশ দান Computer Assisted Instruction :

কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রোগ্রাম কার্যক্রম বা সূচীবন্ধ শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করাকে বলা হয় কম্পিউটার সহায়তায় নির্দেশ দান বা CAI। এই ধরনের প্রোগ্রামে সাধারণতঃ কোন একটি বিষয়ের উপর ফ্রেম বা বিষয়বস্তু উপস্থাপনা করা হয়। কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রোগ্রাম করলে—সম্পদ ও খরচের সাশ্রয় হয়। সময় বাঁচে এবং শিখনের উপযোগিতাও বাড়ে। সাধারণতঃ কম্পিউটার মাধ্যমে নির্দেশদান প্রক্রিয়া—ছাত্রদের শিখন এবং লাইব্রেরী, সম্পদ ও পরিচালনা ব্যবস্থাপনার কাজে বহুল ব্যবহৃত হয়।

২.৫ ❑ শিক্ষার লক্ষ্যের শ্রেণি বিভাগ (Taxonomy of Educational objectives)

২.৫.১ শিক্ষার লক্ষ্যের ধারণা (Concept of Educational Objective) :

শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিখনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ অর্থাৎ সার্বিক বিকাশ ঘটানো। আবার কারও কারও মতে শিক্ষা হল মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার বিকাশ ঘটিয়ে শিক্ষার্থীকে এদিকে যেমন সামাজিক দায়িত্ব পালন, জীবিকা অর্জনে ও সঠিক ব্যক্তিত্ব বিকাশ সক্ষম করা ; অন্যদিকে শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে সৃজনীক্ষমতা, আত্মতৃপ্তি ও উন্নততর জীবনে প্রবেশের পথ সহজ করা। কিন্তু একজন শিক্ষক যখন ক্লাসে পঠন-পাঠনের পরিকল্পনা করেন বা পরিচালনা করেন তখন তারপক্ষে এইসব বৃহত্তর ও চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া প্রায় অসম্ভব। আসলে শিক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ ঘটানো একটি দীর্ঘমেয়াদী ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। স্কুলের বা কলেজের প্রতিদিনের পঠন-পাঠনে অথবা নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে বা সমগ্র শিক্ষা জীবনে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার প্রান্তিক উদ্দেশ্যর কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়ে থাকে। তাই এইসব প্রান্তিক চরম লক্ষ্যগুলি প্রতিদিনের পাঠে বা পাঠ্য পুস্তকের বিষয় নির্বাচন করার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে নির্দেশ দান করতে পারে না। সীমিত সময় সীমার মধ্যে কিভাবে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা যাবে তার জন্য প্রয়োজন তাৎক্ষণিক লক্ষ্য স্থির করা।

কোন বিষয়ের পাঠক্রম প্রস্তুতি করার সময় বা প্রতিদিনের পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে পাঠক্রম প্রস্তুত কারক বা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জানা দরকার কি বিষয় বস্তু উপস্থাপনা করা/বা পড়ানো হবে, কি পদ্ধতিতে পড়ানো হবে, তার পরিবর্তে শিক্ষার্থীর আচরণের কি পরিবর্তন হবে এবং তা কিভাবে মূল্যায়ন করা যাবে। এইসব

প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় উপযুক্ত তাৎক্ষণিক লক্ষ্যের মাধ্যমে। শিক্ষার কাম্যলক্ষ্যের উদ্দেশ্যে পাঠ্য পুস্তক নির্দেশদান নক্শা, প্রোগ্রাম শিখন কার্যক্রম ও প্রতিদিনের পাঠের সম্পর্ক ও সফলতা নির্ভর করবে প্রতিটি পদক্ষেপের সুনির্দিষ্ট তাৎক্ষণিক নির্বাচন করার উপর। সহজ কথায় এইগুলিই হল শিক্ষার লক্ষ্য (Educational Objective)। শিক্ষার লক্ষ্যের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে—

শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য অর্জনের পথে কোন একটি পর্যায়ে (কোর্সে পাঠ্যক্রমে, পাঠে, প্রোগ্রামে, ইত্যাদিতে) ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠশেষে কি আচরণ করতে পারবে সে সম্বন্ধে অর্থাৎ সম্ভাব্য অর্জিত আচরণ পরিবর্তন সম্বন্ধে একটি প্রান্তিক আগাম ধারণা। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য সার্বিক উদ্দেশ্য অর্জনের ধাপ বা পদক্ষেপ। শিক্ষকরা সাধারণত: শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্যের উপর ততটা গুরুত্ব দেন না। তিনি সাধারণভাবে পঠন-পাঠনের লক্ষ্য স্থির করে নেন যাতে পড়ুয়ারা পরবর্তী ধাপে এগিয়ে যেতে পারে। তাই শ্রেণিকক্ষের পঠন-পাঠনের সময় শিক্ষার লক্ষ্য এক স্তর থেকে অন্য স্তরে, এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে অথবা এক মানুষ থেকে অন্য মানুষের ক্ষেত্রে আলাদা হতে পারে। শিক্ষার তাৎক্ষণিক লক্ষ্য সাধারণভাবে বিষয় ও শিক্ষার্থী নির্ভর হয়ে থাকে। আসলে শিখনের উপর শিক্ষার্থীর আচরণে প্রত্যাশিত যে পরিবর্তন ঘটবে বা আচরণের প্রগতি হবে সেই প্রত্যাশিত অন্তিম ফলই হল শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী প্রত্যাশিত আচরণের পরিবর্তন তিন প্রকারের হতে পারে—মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সঞ্চালক বা দৈহিক প্রতিক্রিয়া মূলক। তাই জ্ঞান বা বোধের বিকাশ, আগ্রহ ও প্রতিন্যাসের পরিবর্তন, শারীরিক ও মানসিক দক্ষতার উন্নতি ইত্যাদি সবই শিক্ষার লক্ষ্য। তাই উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণে এইসব কাম্য আচরণ পরিবর্তন আনাই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য। আর শিক্ষার চরম লক্ষ্যের সাথে বিভিন্ন স্তরের তাৎক্ষণিক লক্ষ্য কিভাবে সম্পর্কযুক্ত তা নীচে উপস্থাপনা করা হল—

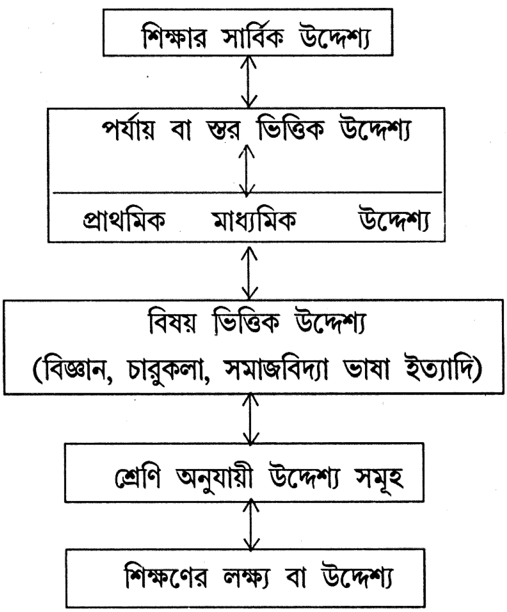

চিত্র—২.৬ শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য ও শিক্ষণের উদ্দেশ্য-এর সম্পর্ক।

সমস্তরকম শিক্ষামূলক কাজের উদ্দেশ্য নিরূপণ হল প্রাথমিক ব্যাপার। শিক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে আমরা যে পরিবর্তন আনতে চাই তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য—

২.৫.২ শিক্ষার লক্ষ্যের শ্রেণি বিভাজন (Taxonomy of Educational Objectives)

আমরা পূর্বোক্ত পাঠে দেখেছি শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে কিভাবে শিখনের বিভিন্ন স্তরে বা পর্যায়ে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে। সাধারণতঃ পঠন-পাঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর তিন ধরনের পরিবর্তন প্রত্যাশা করা হয়। এগুলি হল মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সঞ্চালক মূলক আচরণ। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই লক্ষ্যের শ্রেণিবিভাগের প্রয়াস প্রথমে শুরু করেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ডঃ বেঞ্জামিন ব্লুম। তার শিক্ষার লক্ষ্যের শ্রেণিবিভাজন বা বর্গীয়করণ নীতি পাঠক্রমের বিকাশ, শিক্ষণ পদ্ধতি ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। ব্লুম শিক্ষার লক্ষ্যের শ্রেণিকে একটি বর্গ (Domain) অ্যাখ্যা দেন। সেই অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্যের তিনটি শ্রেণি বিভাজন করা হয়েছে। এগুলি হল—

(ক) জ্ঞান বর্গ (Cognitive domain)

(খ) প্রক্ষোভ বর্গ (Affective domain)

(গ) সঞ্চালন বর্গ (Psychomotor Domain)

অধ্যাপক বেঞ্জামিন ব্লুম 1956 সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কাজ শুরু করেন এবং জ্ঞান বর্গের উদ্দেশ্যাবলির বর্গীয় করেন। ব্লুমের পথ অনুসরণ করে অধ্যাপক ক্রাথওল (1964) কাজ করেন আবেগ-অনুভূতির এলাকা নিয়ে। তার পরে অধ্যাপক সিমসন (1972) সালে সঞ্চালনমূলক এলাকা নিয়ে কাজ করেন।

২.৫.৩ ❏ জ্ঞানবর্গের লক্ষ্য সমূহ (Objectives Under Cognitive Domain)

জ্ঞান বর্গের অধীনে শিক্ষার যে লক্ষ্যের কথা উল্লেখ হয়েছে সেখানে শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা অর্থাৎ স্মৃতি, চিন্তন, বোধ, বিকার ক্ষমতা ও সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বিষয় বস্তু ও শিখনের শ্রেণি বিন্যাস করা হয়েছে। এক কথায় স্মৃতি ও বুদ্ধি সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা এই শ্রেণি বিন্যাসের আওতায় থাকে। সাধারণ ভাবে এখানে সহজ থেকে জটিল মানসিক প্রক্রিয়ার ক্রমবিন্যাস করার উপর জোর দেওয়া হয়। ব্লুম নিম্নলিখিত ছয়টি লক্ষ্য স্থির করেছেন।

(১) অবগতি (Knowledge) : এখানে শিক্ষার্থীর জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংজ্ঞা, নীতি, বিশেষ তথ্য, কোন বিশেষ বস্তু নিয়ে কাজ করার উপায় ও পদ্ধতি, পদ্ধতি বিজ্ঞান, চিরন্তন সত্য, নীতিসমূহ ও তা সাধারণীকরণ কিভাবে হয়েছে ইত্যাদিকে জানানো ও শিক্ষার্থীর স্মৃতিতে সংরক্ষণ করার উপর জোর দেওয়া হয়। এই অবগতির পর্যায় নির্ভর করে শিক্ষার্থীর স্মৃতি ও তথ্য সংগ্রহের সুযোগের উপর। অবগতি আসলে শিখনের সর্বনিম্ন স্তরকে প্রতিনিধিত্ব করে।

(২) বোধ (Comprehension)—এই পর্যায়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিষয় নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে পারে কিনা, সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাখ্যা করতে পারে কিনা তা জানা। উদাহরণ দেওয়া বা

অনুবাদ করা, বাক্য রচনা করা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উপলব্ধি বা বোধ শক্তির মূল্যায়ন করা এই শ্রেণির লক্ষ্যের অন্তর্গত। জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে এটি প্রাথমিক স্তর।

(৩) প্রয়োগ (Application) : অর্জিত ধারণা, নিয়ম নীতি, কার্যক্রম বা সাধারণ তত্ত্ব কোন পরিচিত বা নতুন পরিস্থিতিতে বা সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে পড়ুয়ারা ব্যবহার করতে পারে কিনা তা জানা হল 'প্রয়োগ সংক্রান্ত লক্ষ্যের অন্তর্গত।

(৪) বিশ্লেষণ (Analysis) : শিক্ষার্থী অধীত বিষয়ের বিভিন্ন পরস্পর সম্পর্কিত অংশ বা উপাদানকে খণ্ড খণ্ড করার ক্ষমতা, বিচ্ছিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ণয় করার সক্ষমতা এবং এই কার্যক্রমের মাধ্যমে কোন শিক্ষণীয় বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ গঠন বা সার্বিক সাংগঠনিক ধারণা গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি এই ধরনের লক্ষ্যের অর্ন্তগত।

(৫) সংশ্লেষণ (Synthesis) : এটি বিশ্লেষণের বিপরীত প্রক্রিয়া। এখানে শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে বিচ্ছিন্ন অংশগুলির সমন্বয় ঘটিয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো। এই সংশ্লেষণ ক্ষমতার সাথে যুক্ত রয়েছে শিক্ষার্থীর মৌলিকত্ব ও সৃজনশীলতা, ইত্যাদি।

(৬) মূল্যায়ন (Evaluation) : বস্তু, পদ্ধতি, ধারণা, ফলাফল ইত্যাদির সত্যাসত্য বিচার বা গুণগত ও পরিমাণগত বিচার করার ক্ষমতার অগ্রগামিতা এই জাতীয় লক্ষ্যের অন্তর্গত। আসলে উপযুক্ত প্রমাণ ও বহির্লক্ষণের সাহায্যে শিক্ষার্থীর বিচার করার ক্ষমতাই হল 'মূল্যায়ন লক্ষ্যের অংশ বিশেষ।

২.৫.৪ প্রক্ষোভ বর্গের লক্ষ্য সমূহ (Objectives Under Affective Domain)

আবেগ, অনুভূতি, সচেতনতা, মূল্যবোধ ইত্যাদির বিকাশ ঘটানো হল এই শ্রেণির লক্ষ্যের অন্তর্গত। ক্রাথওল এই এলাকার লক্ষ্যগুলিকে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন। যথা মনোযোগদান, প্রতিক্রিয়াকরণ, গুরুত্ব আরোপ, সংগঠিতকরণ, মূল্যবোধের মাধ্যমে চরিত্র গঠন ইত্যাদি।

(১) গ্রহণ বা মনোযোগ দান (Receiving or attending) : শিখনের প্রাথমিক শর্ত হল শিক্ষার্থীর মনোযোগ ও আগ্রহ সৃষ্টি করা। উপযুক্ত মনোযোগ ও আগ্রহ সৃষ্টি হলে বিশেষ ঘটনা, বিষয়বস্তু, কার্যক্রম ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে সচেতন করা যাবে। তাই এই শ্রেণির লক্ষ্যের অন্তর্গত হচ্ছে উপযুক্ত উদ্দীপকের সাহায্যে গ্রহণ করার ইচ্ছা সচেতনতা ও সংবেদন বৃদ্ধির বিকাশ ঘটানো।

(২) প্রতিক্রিয়াকরণ (Responding) : গ্রহণ করার স্তরের পরবর্তী স্তর হল সাড়া দেওয়া। এই স্তরে শিক্ষার্থীর কাজ হচ্ছে সক্রিয় ভাবে ও প্রেষণার পরিপ্রেক্ষিতে কোন জ্ঞান অর্জনে সাড়া দেওয়া ও তৃপ্তি লাভ করা। ফলে পঠন পাঠনের সঙ্গে প্রাক্ষোভিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যেমন সঠিক উত্তর দেওয়ার আনন্দ লাভ আবার মনোযোগ ব্যহত হলে শংকিত হয়ে পড়া ইত্যাদি।

(৩) গুরুত্ব আরোপ (Valueing) গুরুত্ব আরোপ করার মধ্যে শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। এর ফলে শিক্ষার্থীর আচরণ সঙ্গাতিপূর্ণ হয়। আসলে শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত জিনিসের মূল্য রয়েছে বলে বিশ্বাস করে সে সেগুলিকে জীবনে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। তাই পঠন-পাঠনের দরুন কোন লক্ষ্য, আদর্শ বা বিশ্বাসের প্রতি একধরনের এক নিষ্ঠতার ফলে আচরণের মধ্যে একটা সঙ্গাতি জন্মায় বা কোন মূল্য সম্পর্কে অঙ্গীকার বন্ধ হয়।

(৪) সংগঠিতকরণ (Organization) : একক মূল্যবোধ থেকে ক্রমশঃ একটা স্থায়ী মুল্যবোধের জটিল সংগঠন তৈরি হয়। শিক্ষার্থীদের কোন পরিস্থিতি অনুযায়ী যে মূল্যবোধ জাগে সেটা তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই মূল্যবোধ বিভিন্ন ধরনের আচরণের মধ্যে একটি সংহতি আনার চেষ্টা করে বা সামগ্রিকভাবে আচরণকে সংগঠিত করার চেষ্টা করে।

(৫) মূল্যবোধের মাধ্যমে চরিত্র গঠন (Characterisation by Values) : সর্বব্যাপ্ত মূল্যবোধ সৃষ্টি হলে, তা মানুষের চরিত্রের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। এই মূল্যবোধের প্রভাব জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে লক্ষ্য করা যায় যা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত হয়। শিক্ষার এই লক্ষ্য অনেকটা পরম উদ্দেশ্যের কাছাকাছি।

২.৫.৫ সঞ্চালন বর্গের লক্ষ্য (Objective Under Psychomotor Domain)

১৯৭২ সালে এলিজাবেথ সিমসন এই বর্গের শ্রেণি বিভাজন করেন। এই লক্ষ্যগুলি হল—প্রত্যক্ষণ, প্রস্তুতি নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া, কৌশল, জটিল সক্রিয়তা, অভিযোজন ও সৃজন—

(১) প্রত্যক্ষণ (Perception) : এই পর্যায়ে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় যেমন শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপক গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করা। এই স্তরে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বস্তু বাছাই করা ও তার সাহায্যে উপযুক্ত সঞ্চালন মূলক আচরণের দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করার উপর জোর দেওয়া হয়।

(২) প্রস্তুতি (set) : কোন বিশেষ ধরনের কাজ করার প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতি তিন ধরনের হতে পারে। মানসিক প্রস্তুতি যেমন আঁকতে হলে শিক্ষার্থীকে ভাবতে হবে কি কি উপকরণের প্রয়োজন। আবার শারীরিক প্রস্তুতি যেমন একটি ত্রিভুজ আকার জন্য কি কি শারীরিক প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন। তেমনি প্রাক্ষোভিক প্রস্তুতি হল আঁকার জন্য ইচ্ছে, মনযোগ ব্যাগ্রতা।

(৩) নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া (Guided Response) : শিক্ষকের সাহায্যে শিক্ষার্থীর বিশেষ বাহ্যিক আচরণ করা। এই আচরণ অনুকরণ করে হতে পারে বা প্রচেষ্টারও ভুলের মাধ্যমেও হতে পারে।

(৪) কৌশল (Mechanism) : কোন প্রকার প্রতিক্রিয়াকে শেখা এবং পরে তা অভ্যাসে পরিণত করা।

(৫) জটিল সক্রিয়তা (Complex Overt Response) : এইস্তরে শিক্ষার্থী জটিল ক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে। উচ্চমাত্রার দক্ষতা অর্জন করলে সেই কাজ সহজ ও

(৬) অভিযোজন (Adaptation) : যে কাজ আগে শেষ হয়েছে তাকে কাজে লাগিয়ে নতুন কিছু করা। যেমন পেন্সিল, কম্পাস ব্যবহারের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন নক্শা করা।

(৭) সৃজন (Origination) : পূর্বার্জিত কৌশল থেকে নতুন ক্রিয়া কৌশল উদ্ভাবন।

২.৬ □ সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গী (System Approach)

২.৬.১ ধারণাগত ভিত্তি (Concept)

শিক্ষা কার্যক্রম একটি পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত বিভিন্ন উপাদানে সমৃদ্ধ গতিশীল সংগঠন। আর শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষাপ্রযুক্তি বিজ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে সুসংবদ্ধ ভাবে এইসব উপাদানের মধ্যে সংহতি বিধান করে শিখন ও শিক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা।

প্রযুক্তির উন্নয়ন ও দ্রুত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পাঠ্যক্রমের জটিলতা ও বিভিন্নতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয় বৃদ্ধি পেয়েছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা, শিক্ষাদানের পদ্ধতি, মাধ্যম, উপকরণ ইত্যাদির। তাই শিক্ষার সার্থক রূপ দেবার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষণ উপকরণ, সুযোগ সুবিধে যন্ত্রপাতি বা পদ্ধতি ইত্যাদির মধ্যে কার্যকরী সমন্বয় ঘটানো যাতে করে একে অন্যের পরিপূরক হয়ে শিক্ষা কার্যক্রমের সঠিক রূপায়ণে সাহায্য করতে পারে। ফলে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সিস্টেম পদ্ধতির মাধ্যমে পূর্ব পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ যাতে করে বিভিন্ন উপাদান, পদ্ধতি ও উৎস, ইত্যাদি বিচ্ছিন্নভাবে না থেকে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হয়ে শিক্ষার গতিশীলতা ও উন্নয়নকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে System পদ্ধতির লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন উপাদান ও পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করে সেটিকে আরো কার্যকর করে তোলা। এরই পাশে পাশে সিস্টেম পদ্ধতির লক্ষ্য হচ্ছে ন্যূনতম পরিশ্রমে ও ব্যয়ে সবচেয়ে ফলপ্রসূ শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হওয়া। অর্থাৎ সিস্টেম পদ্ধতি হল শিক্ষার সমস্যার সমাধান প্রক্রিয়া।

২.৬.২ সিস্টেমএর সংজ্ঞা (Definition of system)

Webster Dictionary System কে ব্যাখ্যা করেছে অনেকগুলি একক কিন্তু পরস্পর সম্পর্কিত কার্যক্রম হিসেবে যার মাধ্যমে আমরা একটা সম্পূর্ণতায় উপনীত হতে পারি। অর্থাৎ এটি হল সংগঠিত পদ্ধতি যার দ্বারা আমরা তত্ত্ব, পদ্ধতি ও নালীগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারি।

এ.কে. জালালউদ্দিন (A.K. Jalaluddin, 1981) বলেছেন—সিস্টেম পদ্ধতি হল পূর্বনির্দিষ্ট ও বিশেষ কোন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে স্বনিয়ন্ত্রিত উপাদান সমূহের গতিশীল সম্পর্কযুক্ত ও কার্যকরী সমন্বয় (A system may be defined as a dynamic, complex, integrated whole consisting of self regulating pattern of integrated and interrelated and interdependent elements organized to achieve the pre-determined and specified objectives).

আর, এল সাকোফ (R.L. Sakoff, 1971) : সিস্টেম হল পারস্পরিক যুক্ত ও পারস্পরিক নির্ভরশীল উপাদান সমূহের সমন্বয় (A system is the set of interrelated independent elements).

ক্রফোর্ড রব (Crowford Robb, 1973) : সিস্টেম হল বিভিন্ন উপাদানের নিয়মমাফিক সুসংগঠন যা স্বকীয় ভঙ্গীতে চলে (System is a systematic organization of the elements that operates in a unique way).

ব্যাঙ্গার্ট (Banghart, 1969) সিস্টেম পদ্ধতি হল একটি সুসংগঠিত পারস্পরিক ক্রিয়াশীল উপাদান

সমূহের সমন্বয় যা সহযোগিতার ভিত্তিতে পূর্বনির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করে (system is an integrated assembly of interacting elements designed to carryout co-operatively a predetermined function)

২.৬.৩ সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of system)

উপরের সংজ্ঞা গুলি থেকে সিস্টেমের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় :

(১) সিস্টেমের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের জটিলতা ও সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

(২) সিস্টেমের উপাদানগুলি পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত, পারস্পরিক ক্রিয়াশীল বা স্বাধীন।

(৩) সিস্টেমের উপাদানগুলি সংযুক্তি বা একক হিসেবে ক্রিয়া করে না। ওরা সামগ্রিক ভাবে কাজ করে।

(৪) সিস্টেমের উপাদান সমূহ স্বয়ংপরিবর্তন শীল ও স্বনিয়ন্ত্রিত।

(৫) সিস্টেম পদ্ধতিতে অংশ বিশেষের চেয়ে সমষ্টির মূল্য অনেক বেশি।

২.৬.৪ নিবিড় শিক্ষণে প্রযুক্ত সিস্টেমের উপাদান ও প্রক্রিয়া (Components of instructional system and its process)

শিক্ষাক্ষেত্রে system পদ্ধতি হল একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রয়াস যার মাধ্যমে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে শিক্ষার জটিলতা হ্রাস ও সমস্যার সমাধান করা হয়। শিক্ষা জগতে এটি সম্ভব কেবলমাত্র পরিকল্পনামাফিক শিক্ষণের পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে শিক্ষাকে একটি system হিসেবে গণ্য করলে। এর দ্বারা শিক্ষার্থী নিজের শিখনকে সংহত ও উন্নত করতে পারে।

শিক্ষাক্ষেত্রে system পদ্ধতি বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগঠিত হয়। নিবিড় শিক্ষণের এই কার্যক্রম বা প্রক্রিয়া নিম্নরূপ :

(১) শিখনের পরিস্থিতি ও পরিমণ্ডল পর্যালোচনা করা। বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও বাঞ্ছিত পদক্ষেপ স্থির করা।

২) শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য ও আচরণ ভিত্তিক লক্ষ্য নিধারণ করা।

(৩) শিখনের অভিজ্ঞতা গুলির নক্শা প্রস্তুত করা।

(৪) শিখনের নক্শা অনুযায়ী শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ও পদ্ধতি নির্বাচন করা।

(৫) সুযোগ সুবিধা সমূহ যথাযথ প্রয়োগ করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিমণ্ডল তৈরি করা।

(৬) সমস্ত প্রকৌশলগুলিকে যথাযথ প্রয়োগ করা।

(৭) উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কার্যকারিতার মূল্যায়ন করা।

(৮) উন্নতমানের শিখনের উদ্দেশ্যে মূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে শিখনের অভিজ্ঞতাগুলির সংযোজন, সংশোধন ও পরিমার্জন করা।

উপাদান (Components)

উপরোক্ত প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে শিক্ষণ কার্যক্রমে মূলত চারটি পরস্পর সম্পর্কিত উপাদান দেখা যায়। এই উপাদানগুলি কিভাবে সম্পর্ক যুক্ত তা চিত্রে দেখানো হল।

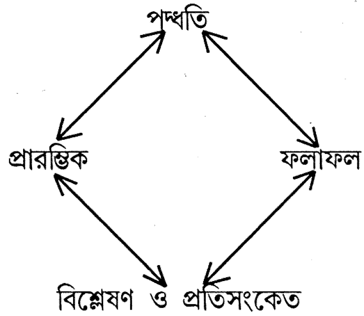

চিত্র—২.৭

আবার এই উপাদান গুলির ভিত্তিতে ক্রিস ও লোয়েন থাল (১৯৭০), বন্দনা মেহরা শিক্ষা প্রক্রিয়ার সিস্টেম মডেল নিম্নরূপে দিয়েছেন :

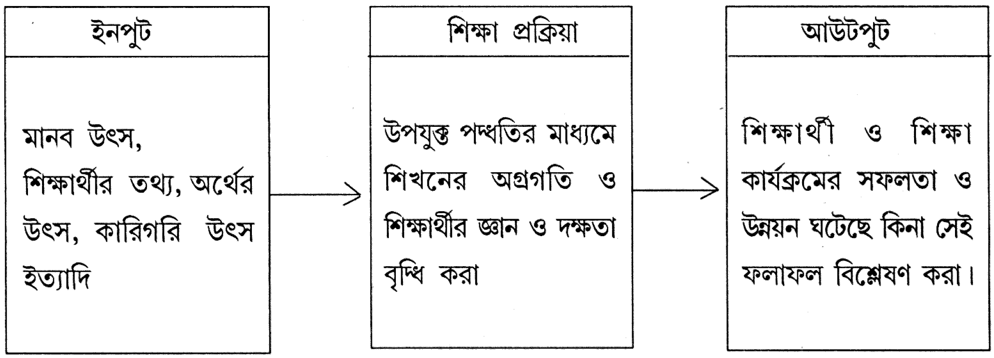

এই মডেল অনুযায়ী সিস্টেমের উপাদান গুলিকে শিখনের নক্‌শা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নানাভাবে পর্যালোচনা ও বিবেচনা করা হয়ে থাকে। সিস্টেম কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সাথে উপাদান সমূহের নিম্নোক্ত উপায়ে শ্রেণি বিভাজন করা যেতে পারে—

প্রারম্ভিক তথ্য :

ছাত্র ছাত্রী প্রসঙ্গে

(ক) বয়স

(খ) প্রারম্ভিক শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যক্রম, শিক্ষার সময় কাল, ইত্যাদি

(গ) আগ্রহ, বুদ্ধি, প্রবণতা ও মনোযোগ চাহিদা,

আর্থিক প্রসঙ্গে

(ঘ) শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে পরবর্তী শিক্ষাক্রমের যোগসূত্র

(ঙ) জীবিকা লাভের সুযোগ ইত্যাদি।

(চ) প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি

(ছ) আর্থিক ব্যবস্থা ও খরচের যোগান।

পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া :

সিস্টেম প্রক্রিয়া পদ্ধতি স্থির করার সময় সবচেয়ে আগে ভাবতে হবে কার্যক্রম যেন নিম্নোক্ত বিষয়ে গুরুত্ব দেয়। —পদ্ধতি যেন প্রয়োজনভিত্তিক হয়।

সিস্টেমের লক্ষ্য শিক্ষা কার্যক্রমের পরিপূরক হতে হবে —এই লক্ষ্য শিক্ষা আচরণে কি পরিবর্তন আনতে পারে? এইসব প্রারম্ভিক অবস্থার প্রেক্ষিতে পরবর্তী পর্যায়ে নিম্নোক্ত উপাদানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়—

(১) পাঠক্রম

শিক্ষণ কৌশল ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি।

মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিকল্পনা

(২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(ক) পরিবেশ ও অবস্থান

(খ) বাড়ী, শ্রেণিকক্ষ, পাঠাগার, ইত্যাদি

(গ) পরীক্ষাগার, কর্মশালা

(ঘ) শিক্ষকের সংখ্যা, দক্ষতা ইত্যাদি

(ঙ) কর্মচারী ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো

(৩) আর্থিক অনুদান ও প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক অবস্থান।

প্রতিসংকেত (Feed back)

(১) ছাত্রদের সফলতা ও মূল্যায়নের মান

(২) বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন

(৩) বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যক্রমের সফলতা ও শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা বিচার ও বিশ্লেষণ

(৪) মূল্যায়নের ভিত্তিতে কার্যক্রমের পর্যালোচনা ও পরিমার্জনা করা।

২.৬.৫ সিস্টেম পদ্ধতির সুবিধা সমূহ (Advantages of system approach)

(১) সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গী সুপরিকল্পিত ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করার নির্দেশ ও কাঠামো প্রস্তুতে সাহায্য করে।

(২) উপকরণ ও পরিবেশের উপযুক্ততা নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে।

(৩) শিক্ষা কার্যক্রমে, মেশিন মানুষ ও মাধ্যম এই তিনের কার্যকরী সমন্বয় ঘটিয়ে শিক্ষার্থীর শিখনকে সহজ ও উন্নততর করতে সাহায্য করে।

(৪) নিরন্তর মূল্যায়ন শিক্ষার্থী ও শিক্ষণ পরিমণ্ডলের বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনতে সহায়তা করে।

২.৭ ❑ সারসংক্ষেপ (Summary)

শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের চারটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গা এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমে বলা হয়েছে নির্দেশদান ও তার নক্‌শা সম্বন্ধে। নির্দেশদান শিক্ষণকে উদ্দেশ্যমুখী ও অর্থবহ করে তোলে। তারজন্য প্রয়োজন হয় নিখুঁত পরিকল্পনা রচনা করা। এই পরিকল্পনাকেই বলা হয় নির্দেশদান বা নিবিড় শিক্ষণের নক্‌শা। নক্‌শা রচনা করার জন্য বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করে একটি ছকের মাধ্যমে সমস্ত কার্যপ্রণালী গুলিকে স্থির করে নেওয়া হয়। একে বলা হয় Specification Table বা Specification Matrix যা পরবর্তী ধাপে শিক্ষকের কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে।

নিবিড় শিক্ষণের একটি প্রধান পদ্ধতি বা নক্‌শা হল সূচীবন্ধ শিখন প্রক্রিয়া। এর পিছনে আছে স্কিনার, মেগার, গ্যানে প্রমুখ মানোবিজ্ঞানীদের গবেষণার ফল। সূচীবন্ধ শিখনের নীতিগুলি হল ছোট ছোট ধাপে, শিক্ষার্থীর নিজস্ব গতিতে, সক্রিয় প্রত্যুত্তর দান ও তাৎক্ষণিক প্রতিসংকেতের মাধ্যমে শিখন। সূচীবন্ধ শিখন পরিকল্পনা সরল ও জটিল দুই প্রকার হতে পারে। কিন্তু এর অনেক সুবিধা থাকলেও সীমাবন্ধতাও যথেষ্ট।

নিবিড় শিক্ষণ ও সূচীবন্ধ নিবিড় শিক্ষণ উভয়ই উদ্দেশ্যমুখী। শিখন ও শিক্ষণের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলি চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেন ব্লুম। এইসব লক্ষ্যগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়। জ্ঞানবর্গ, প্রক্ষোভবর্গ এবং সঞ্চালন বর্গ। প্রথমটি স্মৃতি, বুদ্ধি, চিন্তা ইত্যাদির সঙ্গো সংশ্লিষ্ট, দ্বিতীয়টি মূল্যবোধ সংগঠনের সঙ্গো এবং তৃতীয়টি সঞ্চালনমূলক দক্ষতা অর্জনের সঙ্গো সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে।

নিবিড় শিক্ষণের আধুনিক চিন্তাধারায় সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে নিবিড় শিক্ষণের বিভিন্ন অংশগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ ও ধারাবাহিক ভাবে প্রতিটি অংশের লক্ষ্যপূরণের মাধ্যমে শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার কথা বলা হয়। এর অনেকগুলি সুবিধা থাকলেও প্রয়োগ সীমাবন্ধ।

২.৮ ❑ প্রশ্নাবলি (Question)

১। নির্দেশ দান নক্‌শা বলতে কী বোঝায়?

২। নির্দেশ নক্‌শার লক্ষ্যগুলি কী?

৩। নির্দেশ দান নক্‌শার প্রস্তুতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করুন।

৪। প্রোগ্রাম শিখনের সংজ্ঞা দিন।

৫। সূচীবন্ধ নিবিড় শিখনের প্রয়োজনীয়তা কী?

৬। সূচীবন্ধ নিবিড় শিখনের মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৭। সূচীবন্ধ নিবিড় শিখনের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

৮। সরল সূচীর নীতি বর্ণনা করুন।

৯। সরলসূচীর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। সরলসূচীর সীমাবন্ধতা ও ব্যবহার বিবৃত করুন।

১০। চিত্র সহকারে জটিলসূচী আলোচনা করুন।

১১। জটিল সূচীর বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করুন।

১২। শিক্ষার লক্ষ্য বলতে কি বোঝেন? সংক্ষেপে তার শ্রেণি বিভাগ নিয়ে আলোচনা করুন।

১৩। জ্ঞানবর্গ ও প্রক্ষোভবর্গের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

১৪। সঞ্চালন বর্গের শ্রেণি বিভাজন উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

১৫। সিস্টেম পদ্ধতি বলতে কী বোঝেন? এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট গুলির বর্ণনা দিন?

১৬। কিভাবে সিস্টেম পদ্ধতি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়?

১৭। সিস্টেম পদ্ধতির উপাদান কী?

১৮। সিস্টেম পদ্ধতির প্রক্রিয়া বিবৃত করুন।

১৯। সিস্টেম পদ্ধতির সংজ্ঞা দিন।

২০। সিস্টেম পদ্ধতির সুবিধে গুলি কী কী?

একক ৩ ❑ শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষণ মডেল (Teaching Methods and Teaching Models)

গঠন (Structure)

৩.১ সূচনা
৩.২ উদ্দেশ্য
৩.৩ শিক্ষণের ধারণা
৩.৪ শিক্ষণ পদ্ধতি
৩.৫ শিক্ষণ কাঠামোর ধারণা
৩.৬ আদর্শ শিক্ষণ কাঠামোর সংজ্ঞা
৩.৭ আদর্শ শিক্ষণ কাঠামোর শ্রেণি বিভাজন
৩.৮ শিক্ষণ কাঠামোর প্রয়োগ ও সীমাবদ্ধতা
৩.৯ অণুশিক্ষণ
৩.১০ দলবদ্ধ শিক্ষণ
৩.১১ সারসংক্ষেপ
৩.১২ প্রশ্নাবলি

৩.১ ❑ সূচনা (Introduction)

আধুনিক কালে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ও প্রযুক্তির দ্রুত প্রসারের সাথে সাথে বিবর্তন ঘটেছে শিক্ষার লক্ষ্য ও পরিধির। শিক্ষার চরম লক্ষ্য বা টারগেট-এর সাথে ভারসাম্য রেখে শিক্ষা কার্যক্রমের সফলতা যেমন নির্ভর করে শিক্ষার্থীর শিখন ও শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মানের উপর। শিক্ষার্থীর শিখনের নমুনা বা শিক্ষার মান আবার প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে শিক্ষকের শিক্ষাদান কার্যক্রমের উপর। এই পর্বে শিক্ষণের প্রয়োজনীয় কৌশল ও আদর্শ কাঠামো নিয়ে আলোকপাত করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয় উপস্থাপনা করা হয়েছে।

৩.২ ❑ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- শিক্ষণ কাকে বলে বলতে পারবেন,
- শিক্ষণের প্রধান পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে পারবেন,
- শিক্ষণের আদর্শ কাঠামোর সংজ্ঞা বলতে পারবেন,

- কাঠামোগুলির শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন,
- কাঠামোগুলির প্রয়োগ ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করতে পারবেন,
- অণুশিক্ষণ সম্বন্ধে অবহিত হবেন, এবং
- দলবদ্ধ শিক্ষণের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.৩ ❑ শিক্ষণের ধারণা (Concept of Teaching)

আধুনিক কালে শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ইত্যাদি ধারণার মধ্যে নানা পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটেছে। শিক্ষা কার্যক্রমের সফলতা নির্ভর করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে। শিক্ষার্থীর শিখন পদ্ধতিকে উন্নত ও সহজতর করতে ব্যবহৃত হয় নানা শিক্ষণ পদ্ধতি। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষণ হল শিক্ষক পরিচালিত সেইসব কার্যক্রম যা শিক্ষার্থীর শিখনের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে তার শিখনের সহায়তা ও অগ্রগামিতা অক্ষুণ্ণ রাখে। শিক্ষণের কার্যকারিতা নির্ভর করে শিক্ষার্থীরা কতটা শিখতে পারলো বা তার ব্যক্তিগত জীবনের মান কতটা উন্নত হল। সাধারণ অর্থে শিখন হচ্ছে একটি গতিশীল প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যবহার ও অভিজ্ঞতার কাম্য পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটে। শিক্ষকের শিক্ষণের মূল লক্ষ্য হচ্ছে উপযুক্ত তত্ত্ব সরবরাহ ও পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীকে শিখন ও দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা ও তাদের শিখন কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে উদ্যোগী করা। এই মর্মে শিক্ষণের প্রধান পদক্ষেপগুলো হল—

(১) শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত নির্দেশদান করা ও শিখনে সাহায্য করা।
(২) শিক্ষার্থীর শিখনের জন্য মনোযোগ ও আগ্রহ তৈরি করা।
(৩) শিক্ষার্থীর মধ্যে কাম্য আচরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
(৪) শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ ও প্রবণতা ও ক্ষমতার উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা।

উপরোক্ত কার্যক্রমের নিরিখে শিক্ষককে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়।

(১) শিক্ষার্থীকে শিক্ষার চরম ও তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য লাভে উদ্যোগী ও সাহায্য করা।
(২) উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং
(৩) শিক্ষার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটানো। এইজন্য শিক্ষকেরা নিম্নলিখিত কাজগুলির উপর জোর দেন—

(১) জ্ঞান ও তথ্য সরবরাহ করা
(২) শিক্ষার্থীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা।
(৩) নির্দেশ দান ও সাহায্য করা।
(৪) শিক্ষার্থীর শিখনের জন্য মনোযোগ, উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টি করা

এছাড়াও শিক্ষণের উদ্দেশে শিক্ষককের বিষয়বস্তু সঠিকভাবে উপস্থাপনা করা, আলোচনা করা, পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা ও কার্যকরী করা, মূল্যায়ন করা ইত্যাদি নানা ধরনের কাজ করার দরকার। এই সমস্ত উপাদানগুলিই সম্মিলিতভাবে শিক্ষণের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

শিক্ষণ ও শিখন একে অন্যের পরিপূরক হয়ে শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সফলতা বজায় রাখার চেষ্টা করে। তবে এক্ষেত্রে একটি কথা বলে রাখা ভাল যে শিখন ও শিক্ষণ পদ্ধতি দুটি সম্পূর্ণ আলাদা স্বত্তা। একজন শিক্ষার্থী যদি কোনো বিষয় ভালভাবে শিখতে না পারে তার মানে এই নয় যে ভাল করে পড়ানো হয়নি বা শিক্ষণ পদ্ধতি উপযুক্ত নয়। আবার কোন ছাত্র উন্নতমানের শিখনের প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করলে ভেবে নেওয়া উচিত নয় যে খুব উন্নতমানের শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষকেরা গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ 'শিক্ষণ' ও 'শিখন' একে অন্যের থেকে দূরত্ব ও এককত্ব (uniquenees) বজায় রেখে শিক্ষা প্রক্রিয়া কার্যকরী করার চেষ্টা করেছেন।

৩.৪ ❑ শিক্ষণ পদ্ধতি (Teaching methods)

শ্রেণি কক্ষের পঠন-পাঠন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে শিক্ষকেরা উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনোযোগ, সাগ্রহ, প্রেরণা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত করে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিকাশে সাহায্য করার চেষ্টা করেন। তাই আধুনিককালে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষণ পদ্ধতি শিখনের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি, সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি ইত্যাদি বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে। এইসমস্ত উপাদানের ভিত্তিতে বিষয়ভিত্তিক ও ব্যক্তি কেন্দ্রিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করার প্রয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষককে তখন 'বিষয়বস্তু' ও 'ব্যক্তি' এই দুই-এর কথা মাথায় রেখে শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন ও পরিচালনা করতে হয়। ফলে শিক্ষণ পদ্ধতিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয় ঃ

ক) তাত্ত্বিক বা বিষয়ভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি (Logical Method of Teaching)

খ) মনোবিজ্ঞান সম্মত শিক্ষণ পদ্ধতি (Psychological Method of Teaching)

ক) তাত্ত্বিক বা বিষয়ভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি :

এই পদ্ধতি মূলতঃ শিখনের বিষয়বস্তু নির্ভর জ্ঞান ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিষয়বস্তুর সমাবেশ ও বিন্যাস ইত্যাদির উপর জোর দেয়। এই পদ্ধতি মূলতঃ শিক্ষার্থীর চিন্তন, মনন ও স্মৃতির প্রক্রিয়াকরণ ও উন্নয়নের উপর প্রভাব ফেলার চেষ্টা করে।

খ) মনোবিজ্ঞান সম্মতঃ পদ্ধতি (Psychological Method)

এই পদ্ধতি আবার শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত। এই পদ্ধতিতে শিশুর বয়স, চাহিদা প্রবণতা, আত্মসক্রিয়তা, ইন্দ্রিয়বিকাশ, অভিযোজন ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হয়। এখানে শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীর স্বাধীনভাবে কাজ করা ও আত্মসচেতনতার মাধ্যমে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের উপর জোর দেন।

শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতিকে গবেষকরা নানাভাবে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। গবেষণার সাহায্যে শিক্ষাবিদ্রা শিক্ষণের উদ্দেশ্যে শিক্ষণ সহায়ক পরিবেশ, যোগাযোগ ও ভাব বিনিময় ইত্যাদির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেবার চেষ্টা করেছেন ও আদর্শ শিক্ষণ কাঠামোর প্রস্তুতির নানা ধারণা বা নির্দেশ দিয়েছেন।

৩.৫ ❑ শিক্ষণ কাঠামোর ধারণা (Concept of Teaching Model)

কোন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার আগে শিক্ষা অর্জনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার। এই পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিক্ষণ কাঠামো (Teaching Model) উপযুক্ত ভূমিকা নেয়। শিক্ষণ কাঠামো নির্দেশ দেয় আদর্শ শিক্ষণ কি রকম হওয়া উচিত। উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় গঠন কাঠামোর ক্রমবিন্যাস, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ভাব বিনিময়ের প্রক্রিয়াকরণ, শিক্ষাগত পরিবেশ সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করা সবই আদর্শ শিক্ষণ মডেলের বা কাঠামোর লক্ষ্য। আদর্শ শিক্ষণ কাঠামো হল নিবিড় শিক্ষণের উপযুক্ত একপ্রকার ছক যাতে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তনের জন্য সহায়ক শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টি করে, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের ভাববিনিময় সুনিশ্চিত করা।

৩.৬ ❑ আদর্শ শিক্ষণ কাঠামোর সংজ্ঞা (Defenition of Models of Teaching)

(১) এন. কে. জাঙ্গীরা ও এ. সিংহ (N. K. Jangira and Ajit Singh, 1983)

শিক্ষা কার্যক্রমে বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পারস্পরিক সম্পর্কিত উপাদানগুলিকে কার্যকরী সহায়ক হিসেবে সংগঠিত করাকেই শিক্ষণ মডেল বলা হয়। এই ক্রমবিন্যাস নির্দেশদান নক্শা বা শিক্ষার পরিমণ্ডল সৃষ্টি ও যথাযথ ব্যবহার করে শিক্ষার কাম্য লক্ষ্যে পৌছতে সাহায্য করে।

(A model of teaching is a set of interrelated components arranged in a sequence which provides guidelines to realize a specific goal. It helps in designing instructional activities and environmental facilities, carrying out these activities)

(২) জয়সি এবং ওয়েল (Bruce Joyce and Mersha Weil, 1972)

শিক্ষণ মডেল হচ্ছে একটি নির্দেশ দান বা শিক্ষণের নক্শা যা পাঠ্যক্রম বা কোর্সের কার্যকারী রূপ এবং শিক্ষকের কর্মসূচী পরিচালনায় সহায়তা করে (Teaching model is a plan or pattern which can be used to shape a curriculum or course to select instructional materials and to guide a teacher's action".

(৩) প্যাসী, সিং ও শ্যানসান ওয়াল (B. K. Passi, L. C. singh and Sansan Wal, 1991) বলেছেন শিক্ষা কার্যক্রম ও পরিবেশের রচনার গাইড লাইন নিয়ে শিক্ষণ মডেল গঠিত। আদর্শ শিক্ষণ কাঠামো হল কোন পাঠ্যসূচীকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে নির্দেশদান নক্শা ও শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার সহায়িকা।

(A model of teaching consists of guide lines for designing educational activities and environments. Model of teaching is a plan that can also be utilized to shape course of studies, to design instructional materials and to guide instruction."

(৪) ইগেন ও অন্যান্যরা বলেছেন আদর্শ শিক্ষণ কাঠামো হল কোন শিক্ষণের কার্যকরী পদক্ষেপের নক্শা যা নির্দেশদানের কাম্য লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে।

(Models are perspective teaching strategies designed to accomplish particular instructional goals)

আসলে আমরা যেমন বাড়ি রাস্তা, ইত্যাদি তৈরি করার সময় বিভিন্ন উপাদানের উপর দৃষ্টি রেখে একটি

কার্যকরী নক্শা তৈরি করা হয় তেমনি শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত পরিবেশ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ভাববিনিময় প্রক্রিয়া, তথ্য জারণ প্রক্রিয়া, আচরণ সংগঠিত করার প্রক্রিয়ার জন্য যে নকশা বা পরিকল্পনা করা হয় তাই শিক্ষণ মডেল।

উপরের সংজ্ঞাগুলি থেকে শিক্ষণ মডেলের নিম্নলিখিত কার্যাবলীগুলি পরিলক্ষিত হয় :

(১) উপযুক্ত শিক্ষণ কৌশল নির্বাচন করা।

(২) শিক্ষার্থীর কাম্য আচরণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করা।

(৩) শিক্ষণের উপযোগী পরিমণ্ডল ও পরিবেশ রচনা করা।

(৪) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সঠিকভাবে যোগাযোগ ঘটানো।

(৫) যথাযথ পাঠক্রম রচনা ও পাঠ্যসূচী নির্ধারণে সহায়তা করা

৩.৭ ❑ আদর্শ শিক্ষণ কাঠামোর শ্রেণি বিভাজন (Classification of Model of Teaching)

Bruce & Mersha শিখনের তত্ত্বের ভিত্তিতে শিক্ষণ কাঠামোর নিম্নলিখিত শ্রেণিবিভাগ করেছেন।

(ক) তথ্যজারণ কাঠামো (Information processing model)

(খ) সামাজিক মতবিনিময় কাঠামো (Social communication model)

(গ) ব্যক্তিকেন্দ্রিক কাঠামো (Person centred model)

(ঘ) আচরণ পরিমার্জন কাঠামো (Behaviour modification model)

(ক) তথ্যজারণ কাঠামো :

এই কাঠামোতে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, চিন্তন ও মনন ক্ষমতা বিকাশের উপরে গুরুত্ব দিয়ে নির্দেশ দান নক্শা ও পাঠ্যক্রম প্রস্তুতির উপর জোর দেওয়া হয়। তথ্যজারণ বা আত্তীকরণ প্রক্রিয়া মূলতঃ শিক্ষার্থীর জ্ঞান আহরণ, সমস্যা সমাধান ও চিন্তা ক্ষমতা বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে নানা নির্দেশ দেয়। এই কাঠামো পরিবেশের থেকে কিভাবে উদ্দীপক গ্রহণ করতে হবে, তথ্য কিভাবে সংগঠিত হবে বা উপস্থাপিত হবে, ঘটনা থেকে তত্ত্বে কিভাবে উন্নীত হবে ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশ দেয়। তথ্যজারণ পরিবারভুক্ত কাঠামোগুলো হল:

(১) ধারণার আয়ত্তকরণ কাঠামো (Concept attainment model)

(২) আরোহ চিন্তন কাঠামো (Inductive thinking model)

(৩) অনুসন্ধান শিক্ষণ কাঠামো (Inquiry training model)

(৪) অগ্রিম সংগঠক কাঠামো (Advance organizer model)

(৫) স্মরণ কাঠামো (Memory model)

(৬) জ্ঞানমূলক বৃদ্ধি কাঠামো (Cognitive growth model)

(খ) সামাজিক মত বিনিময় কাঠামো :

এই শ্রেণির কাঠামো ব্যক্তির সামাজিক আচার আচরণ, সুনাগরিকত্ব, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও

সামাজিক কাজকর্মের উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দেয়। ফলে এই কাঠামোই ব্যক্তির সামাজিক কাজ ও অন্যান্য সমাজবদ্ধ লোকের সঙ্গে ভাবের আদান ও অভিযোজন ঘটানোর প্রক্রিয়া ও নির্দেশদান পরিকল্পনা করে। এই শ্রেণির কাঠামোর মধ্যে রয়েছে—

(১) দলগত অনুসন্ধান (Group investigation)
(২) ভূমিকা অভিনয় (Role playing)
(৩) সামাজিক ব্যবহার শাস্ত্রীয় অনুসন্ধান (Jurisprudential model)
(৪) পারস্পরিক ভাববিনিময় কাঠামো (Interpersonal and social skill model)
(৫) সামাজিক উদ্দীপনা কাঠামো (Social stimulation model)
(৬) সামাজিক অনুসন্ধিৎসা কাঠামো (Social inquiry model)

(গ) ব্যক্তিভিত্তিক কাঠামো :

ব্যক্তির আত্মসচেতনতা, আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর এই কাঠামো বিশেষ গুরুত্ব দেয় ও কার্যক্রম সংগঠিত করতে নির্দেশ দান করে। ব্যক্তি কিভাবে বিভিন্ন শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারবে, জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়ন করতে পারবে এই সবই এই কাঠামোর অর্ন্তভুক্ত। এই কাঠামোতে ব্যক্তির আবেগ ও অনুভূতির পরিচর্যা ও উন্নয়ন করা হয়। এই কাঠামোর অন্তর্গত হল—

(১) সচেতনতা শিক্ষা (Awareness training)
(২) অনির্দেশাত্মক শিক্ষণ (Non directive teaching)
(৩) সৃজনমূলক কাজ ও মৌলিক চিন্তা ভাবনার শিক্ষা (Synetics)
(৪) ব্যক্তির নমনীয়তা ও গভীরতা বৃদ্ধির শিক্ষা (Conceptual system)
(৫) সামাজিক সমস্যা সমাধান শিক্ষা (Social problem solving training)

(ঘ) আচরণ পরিমার্জন কাঠামো :

শিক্ষার বিষয়গুলিকে ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে আচরণগত পরিবর্তনকে স্থায়ীকরণের জন্য কৌশল পরিবর্তন ও প্রক্রিয়াকরণ এই কাঠামোর আওতায় পড়ে। এই কাঠামোর মূল প্রবর্তক হলেন আচরণবাদী শিক্ষাবিদ স্কিনার। Skinner-এর প্রবর্তিত সাপেক্ষ অনুবর্তন ক্রিয়া এই কাঠামোর রূপায়ণের মূল ভিত্তি। এই কাঠামোর মূল বৈশিষ্ট্য হল :

(১) দুর্ভাবনা কমানো (Anxiety reduction)
(২) বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ (Assertive training)
(৩) আচরণ পরিবর্তনের সরাসরি প্রক্রিয়া (Direct training)
(৪) আত্মনিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা (self-control training)
(৫) চাপ কমানোর শিক্ষা (stress relaxation training)

৩.৮ ❑ শিক্ষণের কাঠামোর প্রয়োগ ও সীমাবদ্ধতা (Application and Limitation of Teaching Model)

শিক্ষণ কাঠামোর মূল ভিত্তি হল শিখনের তত্ত্ব। তাই এগুলিকে অনেকে আবার শিখনের মডেল হিসেবে বলে থাকেন। শিখনের তত্ত্বগুলির গ্রহণযোগ্যতা যেহেতু সর্বজন স্বীকৃত তাই শিক্ষণ কাঠামোর গ্রহণযোগ্যতাও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত। দৈনন্দিন পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া সংগঠনে এইসব কাঠামো প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় এর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এগুলি হল—

(১) পাঠ্যক্রমের সব ধরনের বিষয়ে সমভাবে এই কাঠামোয় প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

(২) সব ধরনের ছাত্র-ছাত্রীর কাজে সমস্ত মডেল প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

(৩) শিক্ষকের পক্ষে সমস্ত মডেল আয়ত্ত করা বা প্রয়োগ করা সম্ভব হয়না। অনেক ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত দুরূহ ব্যপার।

(৪) পরিকল্পনা মাফিক শিক্ষাকার্য পরিচালনা করা পরিশ্রম, ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ।

(৫) শ্রেণিকক্ষে বিশেষ ধরণের আয়োজনের প্রযোজন বলে অনেক কাঠামো বাস্তব অবস্থায় প্রয়োগ করা সম্ভব হয়না।

৩.৯ ❑ অণুশিক্ষণ (Micro Teaching)

শিক্ষার্থীর অর্জিত শিক্ষার মান শিক্ষকের শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া ও মানের উপর নির্ভর করে। শিক্ষণ-শিক্ষা প্রক্রিয়াকে অর্থবহ, উপযোগী ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে নানা প্রকৌশল সৃষ্ট হয়েছে। এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অণুশিক্ষণ প্রকৌশল।

যে পদ্ধতিতে শিক্ষকগণ অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীকে নিয়ে স্বল্প সময়ে কোন একটি শিক্ষণ কৌশল চর্চা করেন তাকে অণুশিক্ষণ বা Microteaching বলে। অণুশিক্ষণের প্রাথমিক শর্ত হল শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং শিক্ষণ-শিখন কাল স্বল্প। অণুশিক্ষণ বিষয়বস্তুর আণুবীক্ষণিক অংশকে নির্বাচন করে শিক্ষা কার্যক্রম সংগঠিত করা হয়। অণুশিক্ষণের সফলতা নির্ভর করে

—ছাত্র সংখ্যার স্বল্পতা

—পাঠ্যাংশের স্বল্পতা

—সীমিত কৌশল

—স্বল্পসময় ধরে আলোচনা করার উপর।

অণুশিক্ষণের আবশ্যকীয় ধাপ হল :

(১) প্রশিক্ষণের জন্য আদর্শ বা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত প্রস্তুত করা

(২) অণুপাঠ প্রস্তুতি।

(৩) শিক্ষণের সময়কাল নির্ধারণ ও শিক্ষণ সংগঠন করা

(৪) পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা

(৫) পুন: পরিকল্পনা
(৬) পুন: শিক্ষণ
(৭) পুন: পর্যালোচনা করা

সাধারণ অর্থে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার জটিলতা কমিয়ে সরলীকরণ করার লক্ষ্যে অণুশিক্ষণ শুরু হয়। অণুশিক্ষণকে শিক্ষণ প্রক্রিয়া না বলে প্রশিক্ষণ বলাই ভাল। এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে উপরোক্ত পদক্ষেপকে নিম্নোক্ত চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে।

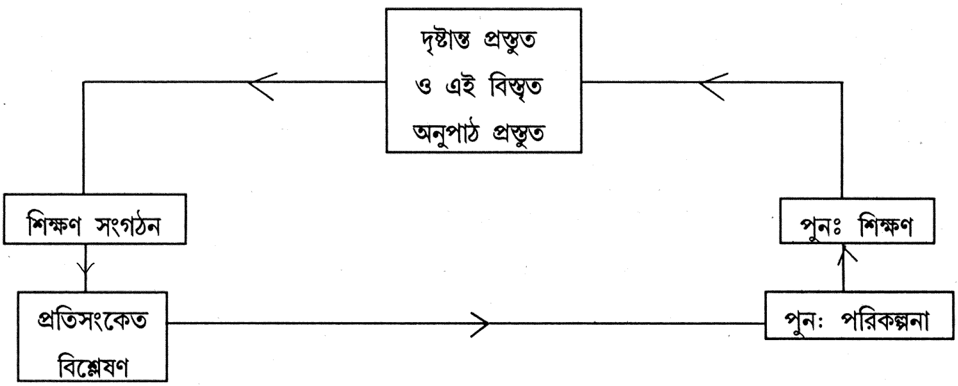

চিত্র ৩.১ অণুশিক্ষণের চক্র

সাধারণভাবে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এই অণুশিক্ষণ প্রক্রিয়ার চর্চা ও অভ্যাসের মাধ্যমে শিক্ষকেরা ভাষণদান, প্রশ্ন করা, আলোচনা চক্র সংগঠন করা ; ইত্যাদি নানা শিক্ষণ পদ্ধতির দক্ষতা অর্জনে সফলতা লাভ করে থাকেন।

অণুশিক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়কে J. C. Clift তিনটি শ্রেণি বা স্তরে ভাগ করেছেন

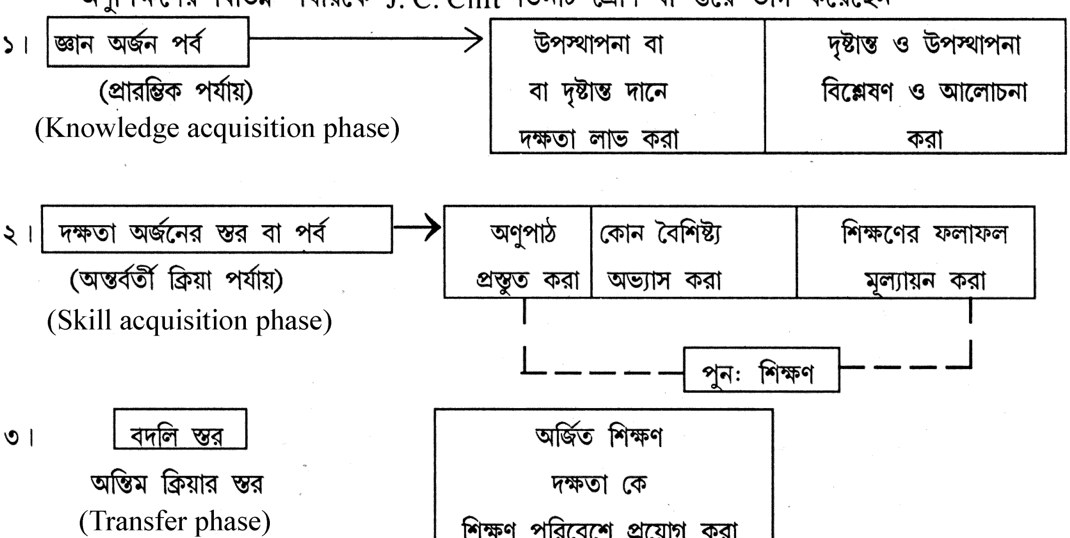

চিত্র ৩.২ : অণুশিক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়

এই অণুশিক্ষণ শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণ সম্পর্কে সচেতন ও সক্ষম করতে বিশেষ কার্যকরী প্রক্রিয়া এই অণুশিক্ষণ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের শিক্ষণ ক্ষমতার উন্নয়নে সহায়তা করে। তাছাড়া শিক্ষণের সময়কাল ও শিক্ষকের বাঞ্ছিত আচরণ সম্বন্ধে আগাম ধারণা অণুশিক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া যায়। তবে নানা বাস্তব কারণে এই অণুশিক্ষণ সবসময় চালু করা সম্ভব নয়। তাছাড়া যেহেতু কৃত্রিম পরিবেশে অণুশিক্ষণ সংগঠিত হয় তাই অনেক সময় শ্রেণিকক্ষে তা শিক্ষণ প্রক্রিয়ার বিকল্প হিসেবে প্রযোজ্য হতে পারেনা।

৩.১০ ❑ দলবদ্ধ শিক্ষণ (Team Teaching)

দলবদ্ধ শিক্ষণ একটি নতুন প্রক্রিয়া। শিক্ষণের উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রক্রিয়ায় কয়েকজন শিক্ষক মিলে দলবদ্ধভাবে শিক্ষণ প্রক্রিয়া সংগঠিত করেন। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছাত্ররা যেমন উপকৃত হয় তেমনি শিক্ষকেরা পারস্পরিক তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের শিক্ষণের কৌশল এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সুযোগ পায়। দলবদ্ধ শিক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

(১) এখানে দু-তিন জন শিক্ষক একত্রে একই বিষয়ের উপর সম্মিলিতভাবে শিক্ষাদান করেন।

(২) প্রতিটি শিক্ষকের শিক্ষণ ক্ষমতা একে অন্যের পরিপূরক হয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

(৩) এটি একটি বিশেষ ধরনের নির্দেশদান প্রক্রিয়া।

(৪) এই ধরনের শিক্ষণে বিভিন্ন শিক্ষকের জ্ঞান, দক্ষতা ও আগ্রহের কার্যকরী সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটে।

(৫) দলবদ্ধ শিক্ষণ অল্প সময়ে অনেক বেশি জ্ঞানদানে সক্ষম হয়।

দলবদ্ধ শিক্ষণের লক্ষ্য হচ্ছে—

(ক) শিক্ষকের দক্ষতা ও জ্ঞানকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো।

(খ) স্কুলের উপকরণ ও রিসোর্সের ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

(গ) শিক্ষকদের মধ্যে সহযোগিতা ও ভাবের আদান-প্রদান করা, সংগঠিত করা।

(ঘ) পড়ুয়াদের মধ্যে উপযুক্ত জ্ঞান সঠিকভাবে সরবরাহ করা।

এই শিক্ষণ তিন ধরনের হতে পারে। এগুলো হলো—

(১) কোন একটি বিশেষ বিভাগের (single discipline)-এর শিক্ষকদের নিয়ে শিক্ষণ সংগঠন করা।

(২) কোর্সের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ নিয়ে দলবদ্ধ শিক্ষণ।

(৩) কোন বিষয়ে সৃজনমূলক কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে শিক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালিত করা।

৩.১১ ❑ সারসংক্ষেপ (Summary)

শিক্ষণ একটি জটিল প্রক্রিয়া যা শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ থেকে শুরু করে শিখনের ফলশ্রুতি পর্যন্ত বিস্তৃত। শিখনের বক্তৃতাধর্মী পদ্ধতি বিষয়ভিত্তিক বা তাত্ত্বিক। কিন্তু মনোবিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষণ প্রধানত:

শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গো সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। শিক্ষণকে উদ্দেশ্যমুখী ও সুনিশ্চিত করার জন্য যে সংগঠিত পরিকল্পনা করা হয় তার নাম শিক্ষণের আদর্শ কাঠামো (Models of Teaching)। শিক্ষণের তত্ত্ব অনুযায়ী এইসব কাঠামোগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়, যেমন, তথ্যজারণভিত্তিক কাঠামো, আচরণমূলক কাঠামো, ব্যক্তিকেন্দ্রিক কাঠামো ইত্যাদি। প্রত্যেকটি আদর্শ কাঠামোর প্রয়োগের সুবিধা ও সীমাবন্ধতা আছে। শিক্ষকের পক্ষে যে সব দক্ষতা তার শিক্ষণের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজন সেগুলিকে আলাদাভাবে অভ্যাস করার মাধ্যমে আয়ত্ত করার পন্ধতিকে বলা হয় অণুশিক্ষণ। আর একটি আধুনিক কার্যকরী পন্ধতি হল দলগত শিক্ষণ।

৩.১২ ❑ প্রশ্নাবলি (Questions)

১। শিক্ষণের আদর্শ কাঠামো বলতে কি বোঝায়?

২। শিক্ষণের আদর্শ কাঠামোর সংজ্ঞা দিন।

৩। শিক্ষণ পন্ধতি বলতে কি বোঝায়? আলোচনা করুন।

৪। শিক্ষণের তাত্ত্বিক ও মনোবৈজ্ঞানিক পন্ধতির ব্যাখ্যা করুন।

৫। শিক্ষণের আদর্শ কাঠামোর শ্রেণি বিভাজনগুলি আলোচনা করুন।

৬। সামাজিক মত বিনিময় কাঠামো বিবৃত করুন।

৭। অণুশিক্ষণ ও দলবন্ধ শিক্ষণ নিয়ে আলোচনা করুন।

৮। আচরণ পরিমার্জন কাঠামোকে কি আপনি শিক্ষণের একমাত্র আদর্শ কাঠামো বলে মনে করেন। যুক্তি সহকারে হ্যাঁ বা না এর ব্যাখ্যা দিন।

৯। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

(ক) শিক্ষণ কাঠামোর সীমাবন্ধতা কী?

(খ) শিক্ষণ কাঠামোর সংজ্ঞা কী?

(গ) শিক্ষণ কাঠামোর লক্ষ্য কী?

(ঘ) তথ্যজারণ কাঠামো কী?

(ঙ) অণুশিক্ষণ কী?

(চ) দলবন্ধ শিক্ষণ পন্ধতি কী?

একক ৪ ❑ যোগাযোগ এবং শ্রেণিকক্ষে ভাবের আদান প্রদান (Communication and Classroom Interaction)

গঠন (Structure)

৪.১ সূচনা
৪.২ উদ্দেশ্য
৪.৩ যোগাযোগের ধারণা ও সংজ্ঞা
৪.৪ যোগাযোগের প্রকারভেদ
৪.৫ শ্রেণিকক্ষের যোগাযোগের বাধা
৪.৬ শ্রেণিকক্ষের কথোপকথন
৪.৭ ফ্ল্যান্ডারের শ্রেণিকক্ষে মিথস্ক্রিয়া বিশ্লেষণ কৌশল
৪.৮ ফ্ল্যান্ডারের মিথস্ক্রিয়া বিশ্লেষণের ধারণাগত ভিত্তি
৪.৯ সারসংক্ষেপ
৪.১০ প্রশ্নাবলি

৪.১ ❑ সূচনা (Introduction)

শিক্ষা কার্যক্রমের সফলতা অনেকাংশেই নির্ভর করে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের উপর। শিক্ষার্থীর সাথে অন্য শিক্ষার্থীর মানসিক যোগাযোগ ও ভাব প্রকাশের মাধ্যমে এই যোগাযোগ প্রক্রিয়া সঠিক হলে শিক্ষক যেমন সহজেই পাঠক্রমের বিষয়বস্তু ছাত্রদের কাছে পৌছে দিতে পারে তেমনি শিক্ষার্থী তার অনুভব ও ক্ষমতা সহজেই অন্যের নিকট প্রকাশ করতে পারে। যোগাযোগ যেমন নানা প্রকারের মাধ্যমে সংগঠিত হয় তেমনি আবার নানা কারণে এই যোগাযোগ প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়ে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমকে প্রতিহত করতে পারে। এই পাঠে শিক্ষা-কার্যক্রমের সফলতার উদ্দেশ্য এইসমস্ত নানা উপাদান ও প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হল—

৪.২ ❑ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা

- যোগাযোগের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ বলতে পারবেন,
- শ্রেণীকক্ষের কথোপকথনের প্রতিবন্ধকতা জানতে পারবেন,
- শ্রেণিকক্ষের মিথস্ক্রিয়ার বিশ্লেষণ সম্বন্ধে অবহিত হবেন,

৪.৩ ❑ যোগাযোগের ধারণা ও সংজ্ঞা (Concept and definition of Communication)

যোগাযোগ শব্দের অর্থ হচ্ছে একে অন্যের সাথে তথ্য, অভিজ্ঞতা ও ভাববিনিময় করা। অনেকে যোগাযোগকে পারস্পরিক বোঝাপড়া বলে মনে করে থাকে।

Communication বা যোগাযোগ কথাটি এসেছে গ্রীক্ ভাষার 'COMMUNIS' শব্দ থেকে যার অর্থ হল সাধারণ। তাই যোগাযোগের মাধ্যমে মানুষে মানুষে ধারণা, রীতিনীতি ও তত্ত্বের আদান-প্রদান করে সহমত বা অভিজ্ঞতা অর্জনে সফল হয়।

সংজ্ঞা : (১) যোগাযোগ কথার অর্থ যার দ্বারা মানুষ নিজের ভাবকে, অনুভবকে একে অপরের সাথে বিনিময় করে।

(২) Aristotle এর মতে যোগাযোগ হল অন্যদের প্রভাবিত করার প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একে অন্যের থেকে কাঙ্খিত আচরণ আশা করতে পারে।

(৩) Dewey বলেছেন যোগাযোগ হচ্ছে এমন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষ একে অন্যের সাথে অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান ঘটায় যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা পারস্পরিক বোঝাপড়ায় উপনীত হতে পারে।

(৪) এডগার (Edgar Dale) এর মতে যোগাযোগ হল পারস্পরিক সহমতের লক্ষ্যে একে অন্যের সাথে ধারণা ও অভিজ্ঞতার বিনিময় বা আদান-প্রদান করা।

শিক্ষা কার্যক্রমে যোগাযোগ হল ধারণা, অভিজ্ঞতা ও তথ্য আদান-প্রদান করার প্রক্রিয়া। সঠিকভাবে মানসিক আদান-প্রদান করতে পারলে মানুষের নিজের শক্তি ও সাহস বাড়ে, তেমনি যোগাযোগের মাধ্যমে মানুষ অন্যের সাহস ও মানসিক ক্ষমতা যোগাতে পারে। সংক্ষেপে যোগাযোগের মাধ্যমে মানুষ তার—

(১) নিজের ধারণা ও জ্ঞান অন্যকে পৌছায়।

(২) নিজের অভিজ্ঞতার সাথে অন্যের অভিজ্ঞতার বিনিময় করে।

(৩) নিজের অভিজ্ঞতা বা অন্যের অভিজ্ঞতার গুণমান নির্ণয় করতে পারে।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক বা শিক্ষার্থী লেখার মাধ্যমে মৌখিকভাবে, অঙ্গভঙ্গী অথবা নীরবতা বজায় রেখেও যোগাযোগ সম্পন্ন করে।

৪.৪ ❑ যোগাযোগের প্রকারভেদ (Types of Communication)

যোগাযোগ সাধারণতঃ নানাভাবে হতে পারে। যেমন একজনের সাথে একজনের, একজনের সাথে অনেকের আবার অনেকের সাথে একজনের বা অনেকের সাথে অনেকের।

সংগঠনগতভাবে যোগাযোগ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) মুখোমুখি যোগাযোগ (Face to Face or Person to Person Communication)

মুখোমুখি যোগাযোগকে প্রত্যক্ষ বা সরাসরি যোগাযোগ বলা হয় এই ধরনের যোগাযোগের সময় একজন বক্তা অপরজন শ্রোতা হিসেবে থাকে। যে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যখন ভাষণ দেন এবং ছাত্ররা শোনে, তখন এই যোগাযোগ সংগঠিত হয়। অনেক সময় মুখোমুখি যোগাযোগকে আন্তর্ব্যক্তিক (Inter-personal)

যোগাযোগ বলা হয়ে থাকে। এই যোগাযোগে শ্রোতারা বক্তার হাবভাব, অঙ্গাভঙ্গী সরাসরি অনুধাবন করতে পারায় বিষয়বস্তু অনেক বেশি সরল করার সুযোগ হয়। এছাড়া এই যোগ মনোযোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তাছাড়া এই যোগাযোগে পড়ুয়ারা নিজের প্রশ্ন ব্যক্ত করার সুযোগ পায়।

(২) লেখা ও পড়ার মাধ্যমে যোগাযোগ (Writing and Reading Communication)

এখানে বই, পত্র পত্রিকা ইত্যাদি লেখা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে এই ধরনের যোগাযোগে শিক্ষার্থীরা লেখকের মনের ভাব সরাসরি প্রত্যক্ষ না করে পরোক্ষে জানে। শিক্ষার্থীরা লেখকের বক্তব্য লেখা পড়ে বোঝে বা আনন্দ পায়। কিন্তু কোথাও সংশয় বা প্রশ্ন জাগলে তা লেখকের কাছ থেকে তা জেনে কাটিয়ে ওঠার সুযোগ পায়না। তবে লেখক বা পাঠক একে অন্যের মনের খবর বা অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানতে পারেন।

৩। দর্শন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যোগাযোগ (Visualizing-Observing Communication)

টিভি, সিনেমা, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে বক্তার সাথে শ্রোতার যে সম্পর্ক স্থাপন হয় তা দর্শন-পর্যবেক্ষণ যোগাযোগ বলা যেতে পারে। এখানে দর্শকের সাথে বক্তার সরাসরি কথা বলার সুযোগ না হলেও শ্রোতারা বক্তার হাবভাব, অভিব্যক্তি ইত্যাদি জানার সুযোগ পায় বলে বক্তার সাথে মানসিক সম্পর্ক হয়। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে দর্শক বক্তার সাথে একাত্ম হয়ে যায় বলে পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নানা রকমের আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

৪.৫ ❑ শ্রেণিকক্ষের যোগাযোগের বাধা (Barriers of Communication)

(১) বক্তার বাচনশৈলী, উচ্চারণ ও বক্তার ধরন পরিস্কার না হলে বক্তব্য আকর্ষণীয় হয়না। ফলে যোগাযোগ ব্যহত হয়।

(২) শ্রেণিকক্ষে বক্তার বক্তব্য শ্রোতার মানসিক অবস্থার সাথে অর্থাৎ তার প্রারম্ভিক জ্ঞান, মনোযোগ, আগ্রহ ইত্যাদির সাথে সম্পর্ক যুক্ত না হলে যোগাযোগের দূরত্ব ঘটে। তখন দুপক্ষের মধ্যে অসুবিধের সৃষ্টি হয়।

(৩) বক্তার বা প্রেরকের বিষয়বস্তুর ধারণা বা জ্ঞান সঠিক বা পরিষ্কার না হলে অর্থাৎ তার অজ্ঞতাজনিত কারণে যোগাযোগ সঠিকভাবে হতে পারেনা।

(৪) শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগের সময় বক্তা বা শ্রোতা কোন মানসিক কারণে অধিক কথা বললে মুখ্য বিষয়ের গুরুত্ব অনেকসময় কমে যায় ও যোগাযোগ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(৫) যোগাযোগের সময় বক্তা বা শ্রোতা অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করলে অথবা দ্রুত এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে চলে গেলে যোগাযোগ প্রতিহত হয়।

(৬) একই বিষয় নিয়ে বারবার বলা হলে একঘেয়ে লাগে তখন দেখা যায় শ্রোতার মনোযোগ কমে যায়।

(৭) শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ নানা কারণে অর্থাৎ মানসিক, বাহ্যিক, শিক্ষণ উপকরণ ও ভাষাজনিত সমস্যার কারণে ব্যহত হতে পারে।

৪.৬ ❑ শ্রেণিকক্ষের কথোপকথন (Classroom Interaction)

শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষক বা রিসোর্স পার্সন এর সাথে ছাত্র বা গ্রহীতার যে যোগাযোগ বা ভাববিনিময় হয় তাই শ্রেণিকক্ষের কথোপকথন নামে পরিচিত। কথোপকথনের মাধ্যমে যে সম্পর্ক গড়ে তা শুধু দু-জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন বস্তু ও নানা ব্যক্তি অর্থাৎ অন্যান্য ছাত্রদের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে।

শ্রেণিকক্ষের যোগাযোগের কার্যকারিতা নির্ভর করে চারটি বিষয়ের উপর

(১) (বক্তা/প্রেরক) সংক্রান্ত বিষয় (Factors related to sender)

ক) প্রেরক/বা বক্তার মানসিক অবস্থা, অনুভূতি ও ধারণা।

খ) গ্রহীতা বা শ্রোতাদের বক্তার সম্পর্কে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা।

(২) **বার্তা বা চিহ্ন** (Factors related to message and symbols)

মৌখিক উপাদান (Factors related to verbal messages)

ক) যথার্থতা ও প্রয়োজনীয়তা।

খ) মৌখিক বার্তাটি কতটা সহজ ও স্পষ্ট।

গ) বার্তার উপযোগিতা ও সাম্মাজ্যতার পরিমাণ ও গুণগত মান।

ঘ) স্বকীয়তা ও উদ্ভাবনী শক্তির মাত্রা

ননভারবেল (Nonverbal) উপাদান

ক) প্রেরক/গ্রহীতার হাবভাব ও অঙ্গাভঙ্গী

খ) মুখের অভিব্যক্তি

গ) বিষয়বস্তুর ক্রমবিন্যাস ও উপস্থাপনার পদ্ধতি

ঘ) বাচনশৈলী, প্রকাশের ভাষা, স্বরের গভীরতা ও নমনীয়তা ইত্যাদি

ঙ) শ্রোতা ও বক্তার মধ্যেকার স্থান, দরত্ব ও নৈকট্য ইত্যাদি

(৩) **গ্রহীতা সংক্রান্ত বিষয়বস্তু** (Factors related to receiver)

ক) বুদ্ধি ও প্রারম্ভিক জ্ঞান

খ) বয়স ও লিঙ্গা

গ) জানার আগ্রহ, প্রয়োজন, মনোযোগ ইত্যাদি

ঘ) প্রবণতা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ইত্যাদি

ঙ) ধৈর্য ও শোনার দক্ষতা

চ) উচ্চাশা ও আত্মবিশ্বাস।

ছ) মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদির পরিমাণ।

(৪) যোগাযোগের পরিমণ্ডল

যোগাযোগের পরিমণ্ডল নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

ক) পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমর্থন

খ) উপকরণ ব্যবস্থাপনা

গ) সমস্যা ও প্রগতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করার সুযোগ

ঘ) দূষণমুক্ত পরিবেশ

ঙ) বাহ্যিক পরিস্থিতি

৪.৭ ❑ ফ্ল্যান্ডারের শ্রেণিকক্ষের মিথস্ক্রিয়া বিশ্লেষণ কৌশল (Flander's Interaction Analysis System) :

সাধারণভাবে পাঠ্যক্রম পরিচালনার সময় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকেরা বেশিরভাগ সময় নিয়ে থাকেন। বিশ্লেষণ করে গবেষকরা বলেছেন যে প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থায় দৈনন্দিন পঠন-পাঠনের সময় শিক্ষকরা প্রায় ৮০% কথা বলেন আর শিক্ষার্থীগণ এর মাধ্যমে প্রভাবিত হন। অবশ্য ছাত্রছাত্রীরা প্রতিসংকেতের মাধ্যমে আবার শিক্ষককে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ ও ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষক যেমন ছাত্রদের প্রভাবিত করেন তেমনি ছাত্ররা একদিকে শিক্ষককে আবার অন্যদিকে সহপাঠীদের সাথে নিজের অনুভূতি বা আবেগ বিনিময় করে। এইভাবেই শ্রেণিকক্ষ হল এমন এই একটা জায়গা যেখানে ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের অনুভূতি ও আবেগ সবই প্রতিফলিত হয়।

প্রত্যেকটি স্কুলে শ্রেণিকক্ষের কথোপকথন চলাকালীন কিছু অলিখিত নিয়ম কাজ করে। এখানে প্রত্যেক কাজকর্ম কিছু নিয়ম মেনে চলে। যেমন শিক্ষক যখন ভাষণদান করেন তখন ছাত্ররা সাধারণভাবে চুপচাপ থাকে, ভাষণ শেষ হলে প্রশ্ন করে। সহপাঠীদের সাথে তখন ভাবের বা অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান করে। শ্রেণিকক্ষের এই অলিখিত নিয়মগুলি নিয়ে নানান বিশ্লেষণ হয়েছে। পারস্পরিক যোগাযোগের গতিশীলতার গুণগত ও পরিমাণগত মান পরিমাপ করার চেষ্টা করেছেন। পারস্পরিক আদান প্রদানের চল বা গতিশীলতা মূলত যে বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে সেগুলিকে মোটামুটি ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন—

(ক) পূর্ব নিদৃষ্ট চল (Prestage Variable) : এগুলি পাঠ শুরু হওয়ার আগের বা প্রারম্ভিক পর্বের বৈশিষ্ট্য। ছাত্রছাত্রীদের প্রারম্ভিক জ্ঞান, প্রক্ষোভ, বুদ্ধি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের উপর শ্রেণিকক্ষের কথোপকথনের গুণমান নির্ভর করে।

খ) প্রক্রিয়াজাত চল (Process Variable) : শ্রেণিকক্ষের পঠন-পাঠন চলাকালীন যে সমস্ত নিয়মনীতি, প্রথা বা চল কার্যকর থাকে তা শ্রেণিকক্ষের মিথস্ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

গ) শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ (Context Variable) : শ্রেণিকক্ষের ভাবের আদান-প্রদান শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।

ঘ) অন্তিম চল (Product Variable) : শিক্ষণের ফলাফলের নমুনা, ছাত্রদের জ্ঞান ও দক্ষতার গুণগত মান, মনোভাব, ঝোঁক ইত্যাদি

এই চারটি 'চল' কিভাবে সম্পর্কিত হয়ে চলে তা নীচে দেখানো হল—

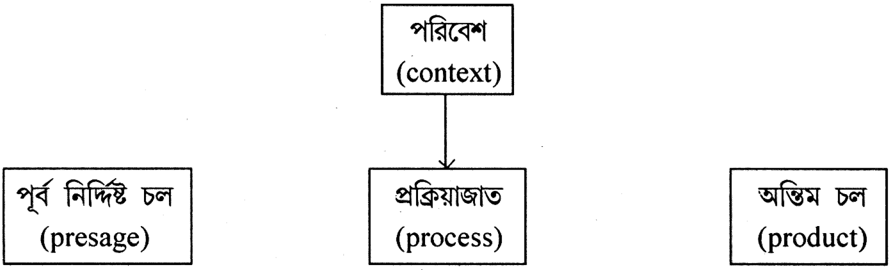

চিত্র ৪.১—'মিথস্ক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত চল'

এই 'চল'গুলি একে অপরের সাথে কিভাবে বিভিন্ন মাত্রার উপাদানের মাধ্যমে গতিশীলতা বা পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া ঘটায় তা নিচের ছকে দেখানো হল—

পূর্ব নির্দিষ্ট চল (Presage variable)	প্রক্রিয়াজাত চল Process variable	প্রেক্ষাপটজাত চল Context variable	অন্তিম চল Product variable
শিক্ষকের প্রেরণা,	শিক্ষকের ব্যবহৃত প্রশংসা	ছাত্রদের সংখ্যা	ছাত্রদের লব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতার মান
ছাত্রদের প্রারম্ভিক জ্ঞান ও মানসিক অবস্থা	ছাত্রকে কতটা সময় দেওয়া হয়েছে/হচ্ছে	পড়ানোর বিষয় বস্তু	শিক্ষকের ধারণা ও অভিজ্ঞতা

চিত্র ৪.২—শ্রেণিকক্ষের চলগুলির শ্রেণি বিভাজন

উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর নানা গবেষক নানাভাবে পর্যবেক্ষন করেছেন। এরই ভিত্তিতে Flander নামক এক শিক্ষাবিদ খুব সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষের আচরণের মিথস্ক্রিয়া বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা করেন। তিনি শ্রেণিকক্ষের মিথস্ক্রিয়াকে মোটামুটি ১০টি পর্যায়ে ভাগ করেন।

৪.৩ শ্রেণিকক্ষে মিথস্ক্রিয়া বিশ্লেষণের ছক

শিক্ষকের কথা/ বক্তব্য		১. শাসন না করে প্রত্যেকের সবরকম আবেগ অনুভূতি মেনে নেওয়া সেটি ভাল বা মন্দ যাই হোক না কেন
	পরোক্ষ প্রভাব	২. ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিটি কাজকে গুরুত্ব দেওয়া, প্রশংসা করা, সাহস দেওয়া ইত্যাদি।
		৩. ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণাগুলি মেনে নিয়ে ভুল থাকলে তা ঠিক করে দেওয়া, তাদের বোঝানো ইত্যাদি
		৪. বিভিন্ন বিষয় বস্তু নিয়ে ছাত্রদেরকে প্রশ্ন করা
	প্রত্যক্ষ প্রভাব	৫. ভাষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয়বস্তু তুলে ধরা, বাস্তবকে তাদের সামনে তুলে ধরা, তাদের ধারণা সম্বন্ধে পরিষ্কার মতামত দেওয়া ও প্রশ্ন করা।
		৬. ছাত্রদের নির্দেশ দেওয়া ও চালনা করা।

	ছাত্র-ছাত্রীদের কথা	৭. ছাত্র-ছাত্রীদের কথা নিয়ে পর্যালোচনা করা, তাদের কথা নিয়ে বোঝানো কোনটা ঠিক বা বেঠিক ৮. ছাত্র-ছাত্রীদের যোগদান---তারা শিক্ষকের সাথে শিখন–শিক্ষণে কতটা যোগদান করেছে। শিক্ষকরা ছাত্রদের দ্বারা কতটা উৎসাহিত বা প্রভাবিত হয়েছেন ৯. ছাত্রদের স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কথা বলা
	নীরবতা বা বিরতি পর্ব	১০. ১) শিক্ষণকালে ছাত্রদের কিছুটা সময় বিরতির প্রয়োজন হয়েছে। ২) বিরতির সময় সাধারণতঃ ছাত্ররা বিশ্রাম নেয় বা চিন্তনের সুযোগ পায়

Flander বিশ্লেষণ মূলতঃ শিক্ষকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের উপর আলোকপাত করেছে। এছাড়াও নীরবতা বা বিরতি কাল যে ভাবের-আদান প্রদানের একটি বিশেষ উপাদান তার উপর তা আলোকপাত করেছেন। কোন observer শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত থেকে প্রতি তিন সেকেণ্ড অন্তর দশটি category-র মধ্যে যেটি শ্রেণিকক্ষে ঘটে সেটি লিখতে থাকেন এবং ক্লাসের শেষে সেই সংখ্যাগুলি (১-১০) কে matrix r সাজিয়ে শ্রেণিকক্ষে মিথস্ক্রিয়ার বিশ্লেষণ করেন।

৪.৮ ❑ ফ্ল্যান্ডারের মিথস্ক্রিয়া বিশ্লেষণের ধারণাগত ভিত্তি (Assumption Under Flander's Interaction analysis) :

(১) সাধারণভাবে শিক্ষকের 'কথা বলা' খুব একটি জোরালো উদ্দীপক হিসেবে শ্রেণিকক্ষে মিথস্ক্রিয়াকে সংগঠিত করতে পারে। শুধু তাই নয় অনেকসময় কথা না বলে শুধুমাত্র হাবভাব ও অঙ্গাভঙ্গীর মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকেরা নানা প্রতিক্রিয়া সংগঠিত করতে পারেন। তাই শিক্ষকের কথা ও অঙ্গাভঙ্গী বা হাবভাব মিথস্ক্রিয়া বিশ্লেষণের বিশেষ উপাদান হিসেবে কাজ করে।

(২) মিথক্রিয়া বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কথা / বক্তব্যের প্রভাব ও উপযোগিতা না বলা অভিব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশি। তাই মিথস্ক্রিয়া বিশ্লেষণের সময় বাচনিক আচরণ প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত।

(৩) শিক্ষক কতটা কথা বললেন তার চেয়ে বড়ো কথা কি বিষয়বস্তু নিয়ে বললেন এবং তার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিক্রিয়া কি প্রকার প্রতিক্রিয়া ঘটছে।

(৪) শেষ কথা হল—শ্রেণিকক্ষের মিথস্ক্রিয়া নির্ভর করে শিক্ষকের শিক্ষণ ক্ষমতা, বাচনশৈলী, ব্যবহার ইত্যাদির উপর। তাঁর মিথস্ক্রিয়া ত্বরান্বিত ও কার্যকরী রূপ দিতে এসব উপাদানের বিশেষ গুরুত্ব প্রয়োজন।

ফ্ল্যান্ডারের এই বিশ্লেষণ শিক্ষকেরা বাস্তবিক ক্ষেত্রে কি কি অসুবিধেয় পড়তে পারেন, তা জানতে সাহায্য করে অথবা তাঁদের শিক্ষণ ক্ষমতা ও শিক্ষণ সহায়ক আচরণের কিভাবে বিকাশ ঘটানো যাবে তা বলে দিতে সাহায্য করে। এছাড়া এই বিশ্লেষণ ছাত্রদের প্রতিসংকেত পাওয়ার কৌশল হিসেবে বিশেষ উপযোগী।

তবে এই বিশ্লেষণে ছাত্রদের চেয়ে শিক্ষকের ক্রিয়াকলাপের উপর বিশেষ গুরুত্ব পড়েছে। এই পদ্ধতি শ্রেণিকক্ষে সব ধরনের কাজকর্মে প্রয়োগ করা যায়না। তাছাড়া এই পদ্ধতি খুব ব্যয়সাধ্য, জটিল ও কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়া।

৪.৯ ❑ সারসংক্ষেপ (Summary)

শিক্ষণ একপ্রকার যোগাযোগ বা ভাব বিনিময়ের প্রক্রিয়া। সেজন্য শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যেসব কথোপকথন হয়, যে সমস্ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও আদান-প্রদান হয় তার গুরুত্ব অসীম। শিক্ষণ ও শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়া নির্ভর করে এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার উপর। ফ্ল্যান্ডার এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক আচরণের পারম্পর্য ও তার নির্দিষ্ট অনুপাত শিখনের সঙ্গে যুক্ত। সেজন্য শিক্ষাবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয়টি জানা অবশ্য কর্তব্য।

৪.১০ ❑ প্রশ্নাবলি (Questions)

১। শ্রেণিকক্ষের যোগাযোগ বলতে কি বোঝায়। যোগাযোগের বিভিন্ন ধরণ নিয়ে আলোচনা করুন।

২। শ্রেণিকক্ষে কথপোকথনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৩। ফ্ল্যান্ডারের মিথস্ক্রিয়া বিশ্লেষণ কৌশল সম্বন্ধে যা জানেন তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৪। শ্রেণিকক্ষের কার্যকর চলগুলি কী ? তা ব্যাখ্যা করুন।

৫। শ্রেণিকক্ষের যোগাযোগের বাধাগুলির বিবরণ দিন।

৬। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

ক) যোগাযোগের প্রকারভেদ।

খ) মুখোমুখি যোগাযোগ।

গ) শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগের সময়ে শিক্ষকের কথা বলার পরোক্ষ প্রভাব।

ঘ) ফ্ল্যান্ডারের মিথস্ক্রিয়া বিশ্লেষণের ধারণাগত ভিত্তি।

একক ৫ ❑ শিক্ষণ প্রকরণ এবং শিক্ষা কার্যক্রমের ধারা (Teaching Aids and Trends of Educational System)

গঠন (Structure)

৫.১ সূচনা
৫.২ উদ্দেশ্য
৫.৩ শিক্ষণ প্রকরণ
৫.৩.১ শিক্ষা প্রকরণের সংজ্ঞা
৫.৩.২ শিক্ষণ প্রকরণ ব্যবহারের মনস্তত্ত্ব
৫.৩.২.১ শিখনের ভিত্তি
৫.৪ শিক্ষণ প্রকরণের শ্রেণিবিভাগ
৫.৪.১ প্রতিফলিত দৃশ্য প্রকরণ
৫.৪.২ অপ্রতিফলিত প্রকরণ
৫.৫ শিক্ষণ প্রকরণ হিসাবে কম্পিউটার
৫.৬ প্রথাগত ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা
৫.৭ দূর শিক্ষা ও পত্রাচার শিক্ষা
৫.৮ সারসংক্ষেপ
৫.৯ প্রশ্নাবলি

৫.১ ❑ সূচনা (Introduction)

এই এককে প্রধানত দুটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা ও শিক্ষণ শুধুমাত্র একমুখী তথ্যের প্রবাহ মাত্র নয়। অর্থাৎ শিক্ষক বক্তা এবং শিক্ষার্থী শ্রোতা ও গ্রহীতা এইটুকু সংকীর্ণ অর্থের মধ্যে শিক্ষা ও শিক্ষণ সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যেও সীমাবদ্ধ নেই। সুতরাং শিক্ষার ব্যাপক ও বহুমুখী প্রয়োগের উদ্দেশ্যে, শিক্ষাকে সর্বস্তরে দ্রুত সার্থকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে দুটি প্রধান অভিমুখ সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে শিক্ষাকে আকর্ষণীয়, স্বচ্ছন্দ এবং কার্যকর করার জন্য নানাপ্রকার শিক্ষা প্রকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে অন্যদিকে সকলের কাছে শিক্ষাকে দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার ধারা সৃষ্টি হয়েছে। আবার একই উদ্দেশ্যে দূরশিক্ষা ব্যবস্থা ও পত্রাচার শিক্ষা ব্যবস্থাও সমান্তরালভাবে শিক্ষাপ্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে চলেছে।

তিনটি প্রসঙ্গাই শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সঙ্গো ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। শিক্ষার প্রকরণগুলির ক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রত্যক্ষ ব্যবহার করা হয়। আবার প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার ক্ষেত্রে ও পত্রাচার শিক্ষার প্রসার, পরিকল্পনা ও প্রয়োগের নানা কাজে শিক্ষা প্রযুক্তি অন্যতম প্রধান বাহন হিসাবে কাজ করে। সেজন্য এই এককটি প্রত্যেক শিক্ষাবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীর পক্ষে জানা একান্ত আবশ্যিক।

৫.২ ❑ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই একককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- শিক্ষণ প্রকরণের সংজ্ঞা বলতে পারবেন,
- শিক্ষণ প্রকরণের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন,
- শিক্ষণ প্রকরণ ব্যবহারের মন:স্তাত্ত্বিক ভিত্তিটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন,
- শিক্ষণ প্রকরণ হিসাবে কম্পিউটারের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন,
- প্রথাগত ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারবেন, এবং
- দূর শিক্ষা ও পত্রাচার শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৫.৩ ❑ শিক্ষণ প্রকরণ (Teaching Aids)

শিক্ষণ কার্যে ব্যবহৃত প্রকরণ বা সংক্ষেপে শিক্ষণ প্রকরণ কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শিখন ও শিক্ষণ, এই দ্বিমুখী প্রক্রিয়া কখনই শুধুমাত্র মৌখিক ভাষার ভিত্তিতে ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারেনা। নানা সহায়ক উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, ব্ল্যাকবোর্ড, ছবি, ম্যাপ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি অসংখ্য উপকরণ শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে কার্যকর করতে সাহায্য করে। সেজন্য শিক্ষা প্রকরণ কাকে বলা হবে, অর্থাৎ কথাটির একটি উপযুক্ত সংজ্ঞা প্রথমেই স্থির করে নেওয়া দরকার।

৫.৩.১ শিক্ষা প্রকরণের সংজ্ঞা (Definition of Teaching Aid)

প্রথমেই বলা হয়েছে শিক্ষাপ্রকরণ কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনও কখনও সংকীর্ণ অর্থেও কথাটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। প্রথমে সংকীর্ণ অর্থ বা সংকীর্ণ সংজ্ঞা বিচার করলে পরে ব্যাপক অর্থটি অনুধাবন করা সহজ হবে।

শিক্ষা প্রকরণের সহজ ও প্রাথমিক সংজ্ঞা হল, যা কিছু উপাদান শিক্ষকের কাজ আংশিকভাবে লাঘব করে বা পরিশ্রম কমিয়ে দেয় সেই সব উপাদানই শিক্ষা প্রকরণ। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী শিক্ষা প্রকরণ শিক্ষকের সাহায্যকারী কিছু কিছু বস্তু যেগুলি ব্যবহার করলে শিক্ষক স্বল্পায়াসে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন। কিন্তু এই জাতীয় সংজ্ঞার প্রধান সমস্যা এগুলি একমুখী এবং আংশিক। কারণ শিক্ষকের কায়িক ও মানসিক শ্রম লাঘব করার চেয়েও বড় প্রশ্ন শিক্ষার লক্ষ্যগুলি কতটা অর্জিত হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীরা কতটা লাভবান হচ্ছে।

শিক্ষণ প্রকরণ (Teaching Aid) কথাটি ব্যবহার করলেও শিখন প্রকরণ (Learning Aid) হিসাবেও এদের ভূমিকা কম নয়। সুতরাং শিক্ষণ-শিখন প্রকরণ (Teaching-Learning Aid) কথাটি বরং আরও উপযুক্ত নাম। এইদিক থেকে বিচার করলে, শিক্ষণ প্রকরণের একটি অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য এবং ব্যাপক সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে।

যে সব উপাদান নিজেরা শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়না কিন্তু পাঠ্যক্রম ভিত্তিক

শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সংহত ও ফলপ্রসূ করার মধ্যে দিয়ে পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে তাকেই বলা হয় শিক্ষণ প্রকরণ। (Those factors which are not included in the curriculum as learning materials but help achieving the goals of curriculum by consolidating the curriculum based teaching learning process and making it effective)।

এই সংজ্ঞায় শিক্ষণ প্রকরণের যে সব বৈশিষ্ট্য স্থান পেয়েছে তার মধ্যে আছে—

—শিক্ষণ প্রকরণ শিখন ও শিক্ষণের সহায়ক।

—শিক্ষণ প্রকরণ পাঠ্যক্রম নির্ভর। অর্থাৎ পাঠ্যক্রম অনুযায়ী স্থির করা হয় কোন সহায়ক কিভাবে ব্যবহার করা হবে।

—শিক্ষণ প্রকরণ শিখন ও শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সংহত করে।

—শিক্ষণ প্রকরণ শিক্ষণকে ফলপ্রসূ করে।

—শিক্ষণ প্রকরণ উভয়মুখী উপকরণ কারণ এর সাহায্যে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই লাভবান হয়।

৫.৩.২ শিক্ষণ প্রকরণ ব্যবহারের মনস্তত্ত্ব (Psychology of Using Teaching Aids)

শিক্ষণ প্রকরণের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রকরণগুলি অপরিহার্য। কথাটা সর্বাংশে ঠিক হলেও একটু অস্পষ্টতা থেকে যায়। শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়াতে সাহায্য বা সহায়তা বলতে কি বোঝায়? অথবা, এই ধরনের সহায়তা কিভাবে হয়, তার ভিত্তি কি? এই প্রশ্নগুলির উত্তর নিহিত আছে একটি বাক্যের মধ্যে। সেটি হল, শিখন ও শিক্ষণ দুইই পরিপূর্ণভাবে মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক প্রক্রিয়া সুতরাং একথা বলা বাহুল্য যে শিক্ষণ-উপকরণেরও যথেষ্ঠ মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি আছে। প্রথমে দেখা দরকার শিখনের মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলি ও অন্যান্য ভিত্তি কি। তারপর শিক্ষণের ভিত্তি ও আলোচনা করা দরকার। এই দুইয়ের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিই শিক্ষণ প্রকরণেরও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি।

৫.৩.২.১ শিখনের ভিত্তি (Basis of Learning)

শিক্ষামনোবিজ্ঞানের পাঠে শিখনের তত্ত্বগুলি আলোচনা করা হয়েছে, এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। শুধু উল্লেখ করা দরকার শিখন আমাদের মধ্যে নিয়ে আসে পরিবর্তন। পূর্ব অভিজ্ঞতা, সক্রিয়তা ও নতুন অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে যে পরিবর্তন আসে তাই শিখন। শিখন মূলতঃ তিন ধরণের আচরনের পরিবর্তন ঘটায়। যথা, জ্ঞানবর্গের পরিবর্তন (Changes in the cognitive domain)

অনুভব বর্গের পরিবর্তন (Changes in the affective domain)

সঞ্চালন বর্গের পরিবর্তন (Changes in the Psychomotor domain)

এই পরিবর্তনগুলির প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে দ্বিতীয় এককে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। শিখনের তাত্ত্বিক ভিত্তিগুলি শিখন প্রক্রিয়াকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছে। শিক্ষা প্রকরণ ও নিবিড় শিক্ষণের মধ্যে যে সংযোগ সে সম্বন্ধে গ্যানের (Robert Gagne) তত্ত্বটি বিশেষভাবে

প্রণিধানযোগ্য। গ্যানে আটরকম শিখন প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন। এই আটকম শিখন প্রকৃতপক্ষে আটটি শিখনের স্তর।

- সংকেত শিখন (Signal learning)—উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অণুবর্তনমূলক আকস্মিক বা অনৈচ্ছিক সংযোগ।
- উদ্দীপক—প্রতিক্রিয়ামূলক শিখন (Stimulus-response learning)—থর্ণডাইক, স্কিনার প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের তত্ত্বে উল্লিখিত উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগ।
- শৃংখলিত করণ (Chaining)—বিচ্ছিন্ন সংযোগগুলির মধ্যে ভাষার ভিত্তিতে যোগসূত্র স্থাপন।
- বাচনিক অনুষঙ্গা (Verbal Association)—পূর্বোক্ত শৃংখলগুলির মধ্যে অনুষঙ্গা স্থাপন। এর ভিত্তিও ভাষা।
- বহুমুখী বিনিশ্চয় (Multiple discrimination)—বাচনিক অনুষঙ্গোর ফলে যে সমস্ত শিখন হয় তার একটির সঙ্গো অন্যটির পৃথকীকরণ।
- ধারণা বা প্রত্যয় (Concept)—বিনিশ্চয়ের ফলে একই বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট বিষয়গুলির শ্রেণীকরণ ও প্রত্যয় গঠন।
- নিয়ম (Rule)—যে নীতির ফলে একটি ধারণা আর একটি ধারণা থেকে আলাদা করা হয় সেই নীতি বা নিয়মটি শেখা।
- সমস্যা সমাধান (Problem solving)—ধারণাগুলির পারস্পরিক সমন্বয়ে সমস্যার সমাধান।

শিখনের তত্ত্ব ছাড়াও ব্যক্তির চাহিদা ভিত্তিক নির্ণায়ক প্রকরণ ব্যবহারের প্রকৃতি নির্ধারণ করে। চাহিদা নির্ণয় করার তিনটি প্রধান ভিত্তি হল, ব্যক্তিত্ব, বৌদ্ধিক বৈশিষ্ট্য এবং অনুসন্ধান প্রবণতা।

ব্যক্তিত্ব (Personality)—ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি মানুষের চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন—

- ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ (Personality trait)—যে ব্যক্তি বহির্মুখী (Extrovert) তার চাহিদা অন্তর্মুখী (Introvert) ব্যক্তির থেকে আলাদা।
- মেজাজ (Temperament)—ব্যক্তিত্বের প্রক্ষোভমূলক ভারসাম্য মানুষের মেজাজের প্রকৃতি স্থির করে এবং চাহিদাও সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

  বৌদ্ধিক বৈশিষ্ট্য (Intellectual Characteristics) চাহিদার নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন,
- বুদ্ধি (Intelligence)—বুদ্ধিমান ও সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের চাহিদা কিছুটা হলেও ভিন্ন।
- বিশেষ প্রবণতা (Aptitude)—একইভাবে যে বিষয়ে বিশেষ প্রবণতা আছে ব্যক্তির চাহিদা তাকে ঘিরে আবর্তিত হয়। অণুসন্ধান প্রবণতা (Disposition for enquiry), যেমন, কৌতূহল (Curiosity), অনুসন্ধিৎসা (Inquisitiveness), সন্দেহ প্রবণতা (Skepticism)। এইসব বৈশিষ্ট্য মানুষের চাহিদার প্রকৃতি ও পরিমাণ স্থির করে।

কিন্তু শিখন ও ব্যক্তিগত চাহিদার প্রকৃতি যাইহোক প্রাথমিকভাবে যে কোন শিখনই ইন্দ্রিয় নির্ভর। সেজন্য বুদ্ধির সক্রিয়তা বজায় রাখার জন্য ইন্দ্রিয়গুলির সক্ষমতাও অবশ্য প্রয়োজন। কারণ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই বহির্জগতের সঙ্গো আমাদের সংযোগ স্থাপন হয়, তথ্য সংগৃহীত হয় এবং তারই ভিত্তিতে পরবর্তী মানসিক প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়।

শিখনের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের ভূমিকা (Role of Sense Organs in Learning)

মনোবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন সমস্তরকম ইন্দ্রিয়ের শিখনের কথা মনে রাখলে নিম্নলিখিত ভূমিকায় আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবহৃত হয়।

ইন্দ্রিয়	সংবেদন	মোট শিখনের শতকরা অংশ
চক্ষু	দর্শন	৮৩
কর্ণ	শ্রবণ	১১
নাসিকা	ঘ্রাণ	৩·৫
ত্বক	স্পর্শ	১·৫
জিহ্বা	স্বাদ	১·০

মোট ১০০·০০

বহির্জগৎ থেকে সংগৃহীত তথ্যের স্বাভাবিকভাবেই তার সবটা সংরক্ষিত থাকেনা। সংরক্ষণের আনুপাতিক হার আর একটি সারণিতে দেখানো হল।

অভিজ্ঞতার উৎস	সংরক্ষিত তথ্যের শতকরা হার	শিখনের পরিমাণ
শ্রবণ লব্ধ অভিজ্ঞতা	২০%	২·২
দর্শনজাত অভিজ্ঞতা	৩০%	২৪·৯
দর্শন ও শ্রবণ একত্রে	৫০%	৪৭·০
শিখনের সময় বা পরে মৌখিক বিবরণ	৪০%	—
মৌখিক বিবরণ ও সক্রিয়তা	৯০%	—

অর্থাৎ ক্লাসে শিক্ষার্থীরা যদি শুধুমাত্র বক্তৃতা শুনে শিখতে চায় তবে শিখনের পরিমাণ হবে মাত্র ২·২% শুধু দেখে শিখলে ২৪·৯% আর একযোগে দেখা, শোনা ও সক্রিয়তার মাধ্যমে শিখলে তথ্যের ৯০% সংরক্ষিত থাকবে।

এই প্রসঙ্গে ডেলের (Edger Dale) বক্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি দৃশ্য ও শ্রুতি মাধ্যমের উপযোগিতার শ্রেণিবিভাগ করতে চেয়ে বলেছেন—মানুষের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় তিনটি উপায়ে।

- সরাসরি কাজ করার সময় প্রত্যক্ষ সংবেদনমূলক সংযোগের মাধ্যমে।
- চিত্র বা অন্য পর্যবেক্ষণযোগ্য বস্তুর মাধ্যমে।
- মৌখিক বা মুদ্রিত বক্তব্য থেকে।

এই তিনটি উপায়ই মূলতঃ দৃশ্য ও শ্রুতি মাধ্যমের নানা প্রকারভেদ। তাঁরমতে শিক্ষণের প্রধান প্রকরণগুলির রূপ হল।

- মৌখিক চিহ্নসমূহ (Verbal Symbols)
- দৃশ্য (Visuals
- বেতার/স্থিরচিত্র (Radio / Still Pictures)
- চলমান চিত্র (Movie)
- প্রদর্শনশালার বস্তুসমূহ (Exhibits in Exhibition)
- শিক্ষামূলক ভ্রমণ (Educational Excursion)
- প্রদর্শন (Demonstration)
- নাটকে অংশগ্রহণ (Participation in Drama)
- গৌণ অভিজ্ঞতা (Secondary Experience)
- প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (Direct Experience)

ডেল দৃশ্য ও শ্রুতি মাধ্যমের উপযোগিতা অনুসারে তাদের মোট ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন।

- প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (Direct Experience)—যে সব অভিজ্ঞতা সরাসরি অর্জিত হয়, সেগুলিই শিক্ষা ও শিখনের প্রধান ভিত্তি।
- গৌণ অভিজ্ঞতা (Secondary Experience)—যে অভিজ্ঞতা নিজে সরাসরি লাভ করা সম্ভব নয় বা সম্ভব হয়নি, তেমন অভিজ্ঞতা অন্যের মুখে শুনে বা পড়ে বা কোন সহায়ক উপকরণের সাহায্যে লাভ করে শেখা।
- নাটকীয় অভিজ্ঞতা (Dramatic Experience)—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ না থাকলেও বিভিন্ন কুশীলবের সাহায্যে কৃত্রিমভাবে এবং ভূমিকাভিনয়ের (Role playing) মাধ্যমে পুনরানুষ্ঠান করে শিক্ষালাভ করা। যেমন, ইতিহাসের কোন ঘটনার অভিনয়, সাহিত্যের কোন অংশের নাট্যরূপ দান ও অভিনয় ইত্যাদি।
- প্রদর্শিত অভিজ্ঞতা (Demonstrated Experience)—যে অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর সামনে করে দেখানো কোন কাজের মাধ্যমে অর্জিত হয়।
- শিক্ষামূলক ভ্রমণ (Educational Excursion)—প্রকৃতি বা প্রকৃত ঘটনাস্থলে ভ্রমণের সময় সংগৃহীত তথ্য এবং সেই সঙ্গো বিনোদন একত্রিত করে শেখা প্রায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সমতুল।
- পরিকাঠামো প্রদর্শন (Exhibition of the Structural Aspect)—এর অর্থ শিক্ষণীয় বিষয়ের সামগ্রিক রূপটি একটি কাঠামোর মাধ্যমে তুলে ধরা। যেমন, চিত্র, চার্ট, ওভারহেড প্রোজেক্টারে দেখানো ইত্যাদি।

৫.৪ ❑ শিক্ষণ প্রকরণসমূহের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Teaching Aids)

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত শিখন ও শিক্ষণ প্রক্রিয়া একমুখী তথ্যের প্রবাহ হিসাবে অর্থাৎ শিক্ষকের দিক থেকে শিক্ষার্থীর দিকে, পরিচালিত। শিখন ছিল শ্রবণ ও স্মৃতি নির্ভর। শিক্ষার্থীর ভূমিকা প্রধানত

নিষ্ক্রিয়। ধীরে ধীরে, সক্রিয়তার ভিত্তিতে শিক্ষালাভের পদ্ধতিগুলি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। যদিও তাত্ত্বিক দিক থেকে সক্রিয়তার কথা বহু পূর্ব থেকেই স্বীকৃত ছিল। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর স্মৃতিতে, প্রত্যয়ে মানসিক প্রতিরূপ (Mental Representation) সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস দেখা যায়। সেজন্য শিক্ষণীয় বিষয়কে যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা তাঁর পরিবর্তে দৃশ্যমাধ্যমে উপস্থিত করার প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে অনস্বীকার্য। মানসিক চিত্রকল্প (Image) তৈরিতে দৃশ্য প্রকরণ ব্যবহারের গুরুত্ব এখানেই। সাধারণত দুই প্রকার দৃশ্য প্রকরণের ব্যবহার দেখা যায়, প্রতিফলিত দৃশ্যপ্রকরণ (Projected Visual Aid) এবং অপ্রতিফলিত দৃশ্যপ্রকরণ (Non-projected Visual Aid)।

৫.৪.১ প্রতিফলিত দৃশ্য প্রকরণ (Projected Visual Aid)

যে সব দৃশ্যমাধ্যম আলোর প্রতিসরণের (Refraction of Light) নিয়ম কাজে লাগিয়ে লেন্সের সাহায্যে স্থির বা সচল চিত্র তৈরি করে পর্দায় প্রতিফলিত করা হয় তাকে বলে প্রতিফলিত দৃশ্য প্রকরণ। যেমন, প্রোজেক্টার, চলচ্চিত্রের প্রোজেক্টার, ভিডিও ক্যামেরা ইত্যাদি। এই জাতীয় প্রকরণের সুবিধা অনেকগুলি।

- অন্ধকার কক্ষে অন্য বিঘ্ন সৃষ্টিকারী উদ্দীপক না থাকায় মনোযোগ ধরে রাখা নিশ্চিত হয়। উজ্জ্বল আলোর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ মনোযোগ দানের আরও সহায়ক হয়।
- সচল বিষয় হলে, দৃশ্যের মধ্যেও নানা বৈচিত্র্য আনা যায়। নানা বর্ণের উপস্থিতিও শিখনের সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- একসঙ্গে অনেককে দেখানো যায় এবং প্রত্যেকেই নিজের মত করে প্রতিফলিত বিষয়ের বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে।
- অল্প সময়ে অনেক কিছু উপস্থিত করা যায়।
- স্মৃতিতে সংরক্ষণ ভালো হয়।
- বিভিন্ন ধরনের দৃশ্য প্রকরণ, স্বল্প ব্যয় থেকে শুরু করে ব্যয়বহুল প্রকরণ, সহজলভ্য হওয়ায় সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষকরা উপযুক্ত প্রকরণ বেছে নিতে পারেন।

একমাত্র সমস্যা এই যে যদি শুধুমাত্র দৃশ্যপ্রকরণ ব্যবহার করা হয় তবে শিক্ষার্থীদের নিষ্ক্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে পারে। ভালো না লাগলে তারা অমনোযোগীও হয়ে উঠতে পারে।

কয়েকটি দৃশ্যপ্রকরণের নাম দেওয়া যেতে পারে।

- Slide—উদ্দেশ্যমূলক স্থিরচিত্র, অঙ্কন, নক্‌শা ইত্যাদি।
- Film strip—চলচ্চিত্রায়িত ঘটনা বা তার অংশ বিশেষ, যেটুকু শিক্ষণের সহায়ক উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা যায়।
- Silent film
- Overhead projector
- Video

উপরোক্ত প্রকরণগুলির প্রত্যেকটিরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বা সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা আছে।

Slide ও Film Strips

বৈশিষ্ট্য — ● Film strip সাধারণত 35 mm মাপের ফিল্ম ব্যবহার করা হয় এবং ছোটপর্দায় প্রতিফলিত করা যায়।

● Slide সহজে নিজেই তৈরি করে নেওয়া যায়।

● Film Strip and Slide বারবার ব্যবহার করা যায়। প্রয়োজন হলে একই ক্লাসে একাধিকবার দেখানো যায়।

● এগুলি সহজে সংযোজন ও পরিবর্তন করা যায়।

● রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ, অল্প জায়গায় অনেক slide ও film strip সংরক্ষণ করা যায়।

● Slide তৈরির খরচ খুব বেশি নয়।

এদের সীমাবদ্ধতাও (limitations) অনেক।

● ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণ না করলে slide ও film strip নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

● সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশগুলি ফিল্মে তোলা হলেও সমস্ত অংশের বেলায় সেটা সম্ভব নয়। ফলে যে অংশটি দৃশ্যরূপে উপস্থিত করা হয়েছে, তার তুলনায় বাকি অংশগুলির প্রতি আগ্রহ কমে যেতে পারে। মনোযোগও কমতে পারে।

● ফিল্ম তৈরির জন্য যে ব্যবস্থা ও যান্ত্রিক আয়োজন দরকার এককভাবে কোন শিক্ষকের পক্ষে তার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এজন্য বিশেষজ্ঞ দরকার।

● ফিল্ম তৈরির কাজ ব্যয়বহুল, প্রদর্শনের জন্যও বিশেষ ধরনের প্রোজেক্টার দরকার।

● পাঠের সমস্ত স্তরে বিশেষত মধ্যবর্তীকালে ফিল্ম strip ব্যবহার করলে, সামগ্রিকভাবে পাঠ ব্যাহত হতে পারে। সাধারণত পাঠের শুরুতে মনোযোগ আকর্ষণ, প্রেষণা সঞ্চার ইত্যাদির উদ্দেশ্যে film strip ব্যবহার করলে তা যথেষ্ট কার্যকর হয়।

● বাণিজ্যিকভাবে যে সব film strip তৈরি হয় তা শিক্ষকের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পূর্ণ নাও মিলতে পারে। তখন শিক্ষণ সমস্যায় পরিণত হয়।

● Film strip বা slide দুই ক্ষেত্রেই প্রদর্শনের পাশাপাশি ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়।

● বর্তমানে ভিডিও ক্যামেরার সহজলভ্যতার দরুণ film strip-এর গুরুত্ব অনেকটা কমেছে।

Over Head Projectar (OHP)

এই ধরনের প্রোজেকটারে ছবি, মুদ্রিত বক্তব্য, এমনকি হাতে লেখা বা আঁকা কোনো কিছুকে বিবর্ধিত আকারে পর্দায় প্রতিফলিত করা যায়। একমাত্র শর্ত যা পর্দায় প্রতিফলিত হবে সেটা স্বচ্ছ পাতলা কোনো মাধ্যমে লেখা বা আঁকা চাই। এর সুবিধা অনেক।

প্রথমত, OHP-র দাম অস্বাভাবিক বেশি নয়। দীর্ঘকাল ব্যবহার করা যায় এবং একমাত্র পরিষ্কার রাখা ছাড়া এর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ খুবই নগণ্য।

দ্বিতীয়ত, প্রতিফলনের উপযোগী স্বচ্ছ মাধ্যম খুব দ্রুত শিক্ষক নিজেই তৈরি করে নিতে পারেন। বিশেষ ধরনের কলম নানা রঙের পাওয়া যায়। ফলে লেখা বা আঁকা রঙিন হতে পারে।

তৃতীয়ত, OHP বহনযোগ্য। স্বচ্ছ মাধ্যমগুলি নষ্ট হলেও তা আবার তৈরি করা যায়। সব কিছুই স্থানান্তর করা খুবই সহজ।

চতুর্থত, যেখানে অন্য ধরনের প্রকরণ ব্যবহার করা সম্ভব নয় বিদ্যুৎ থাকলে OHP সেখানে একটি আদর্শ প্রকরণ।

পঞ্চমত, সম্পূর্ণ অন্ধকার কক্ষের প্রয়োজন নেই।

ষষ্ঠত, শিক্ষকের সমস্ত মনোযোগ ছাত্র-ছাত্রীদের উপর নিবিষ্ট রাখা সম্ভব হয়। বোর্ডে বার বার লিখতে বা আঁকতে হলে ক্লাসের প্রতি মনোযোগ বজায় রাখা কঠিন হয়, ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

সপ্তমত, OHP ব্যবহার করা অত্যন্ত সহজ। এরজন্য কোন প্রশিক্ষণ দরকার হয়না। একবার দেখে নিলেই যথেষ্ট।

তবে OHPতে বিদ্যুতের খরচ বেশি। কাজেই বিদ্যুতের সংযোগ ভালো না থাকলে OHP ব্যবহার করা যায় না।

শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র (Educational Film)—শিক্ষার উদ্দেশ্যে নির্মিত চলচ্চিত্রকেই শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র বলে। কিন্তু শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র কোন পাঠ্যাংশের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয় না। একটি পূর্ণাঙ্গ (স্বল্প দৈর্ঘ্যের বা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের) চলচ্চিত্র যার বিনোদন ও নান্দনিক মূল্য বজায় আছে অথচ চলচ্চিত্রটি দেখে স্বাভাবিকভাবেই দর্শকরা তাঁর অন্তর্নিহিত শিক্ষাটুকু গ্রহণ করতে পারেন, এরকম চলচ্চিত্রকেই শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র বলা হয়।

শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রের সুবিধার দিক ও বৈশিষ্ট্য অন্য প্রকরণগুলি থেকে স্বতন্ত্র।

প্রথমত, সামাজিক বিষয়, বৈজ্ঞানিক এবং ভৌগোলিক বিষয় এবং জীবজগৎ সম্বন্ধে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র তৈরি হতে পারে। জীবনীমূলক চলচ্চিত্রও শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র। কিন্তু এক একটি বিচ্ছিন্ন বিষয়ের উপর আলাদা আলাদা চলচ্চিত্র নির্মিত না হয়ে সমন্বিত বিষয়ের উপর চলচ্চিত্র নির্মিত হলে একসঙ্গো অনেকটা বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে পারে শিক্ষার্থীরা। যেমন, কোনো অভিযান ও অভিযাত্রীকে অবলম্বন করে নির্মিত শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখে ছাত্রছাত্রীরা ভৌগোলিক, জীবজগৎ সম্পর্কীয়, আবহাওয়া বিজ্ঞান ইত্যাদি অনেকগুলি বিষয় শিখতে পারে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রে অনেকসময়ই কিছু কাহিনী থাকে। ফলে গল্পের মধ্যে দিয়ে শেখা সহজ হয়।

তৃতীয়ত, নান্দনিক ও বিনোদন মূল্য বেশি থাকায় এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৌন্দর্য চেতনা, বহির্জগতের প্রতি, পরিবেশের প্রতি ইতিবাচক প্রতিন্যাস তৈরি হয়।

চতুর্থত, বিনোদনের মাধ্যমে শেখার ফলে শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং তারজন্য কোনো স্বতন্ত্র প্রেষণা সঞ্চারের প্রয়োজন হয়না।

পঞ্চমত, যে সব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয় (যেমন, মেরু অঞ্চল সম্বন্ধে কোনো শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র) সেগুলি সম্বন্ধে বাস্তবসম্মত শিক্ষালাভ করা সহজ হয়, ও তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

ষষ্ঠত, শিক্ষকের ভূমিকা শুধুমাত্র শিক্ষাগত তাৎপর্য আছে এমন অংশগুলি চিহ্নিত করে দেওয়া এবং প্রয়োজন মত ব্যাখ্যা করে দেওয়ায় সীমাবদ্ধ থাকে। সবাক শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র (যেমন, টেলিভিশনে

Discovery Channel কিংবা National Geographic Channel-এ প্রদর্শিত শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রগুলি) হলে, শিক্ষকের ভূমিকা আরও গৌণ হয়ে পড়ে।

শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পূর্বে ও পরে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকের দিক থেকে কয়েকটি করণীয় কাজ শিখনে সাহায্য করে।

প্রথমত, চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আগে শিক্ষক সাধারণভাবে বিষয়বস্তুটি সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তুলতে পারেন। ঐ প্রসঙ্গে কি কি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, সমস্যা আছে সে সম্পন্ধে প্রাথমিক ধারণা থাকলে শিক্ষার্থীরা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে অংশ বিশেষের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, চলচ্চিত্র চলাকালীন কোনো ব্যাখ্যা বা আলোচনা বাঞ্ছনীয় নয়।

তৃতীয়ত, প্রত্যেক শিক্ষার্থী হাতের কাছে ছোটো নোটবুক রাখতে পারে যাতে কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য থাকলে সে সংক্ষেপে লিখে রাখতে পারে।

চতুর্থত, চলচ্চিত্র শেষ হলে শিক্ষক উদ্যোগী হয়ে একটি আলোচনার সূত্রপাত করতে পারেন। এই আলোচনায় সমস্ত ছাত্রছাত্রী তাঁর মন্তব্য, জিজ্ঞাস্য বিষয়, ব্যাখ্যা ইত্যাদি তুলে ধরতে পারে এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি বুঝে নিতে পারে।

পঞ্চমত, আলোচনার শেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থী সমস্ত প্রসঙ্গগুলি, তারা কি কি শিখেছে, তাদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার বিচারে মূল্যায়ন ও বিচার ইত্যাদি সবকিছুই লিখে রাখতে পারে। কাহিনীর চুম্বক বা বর্ণনার সারসংক্ষেপ তৈরিতে উৎসাহ দিলে ছাত্রছাত্রীদের বোধ (Comprehension) উন্নততর হবে।

শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রের অসুবিধাগুলির মধ্যে আছে—

- পাঠক্রমের সমস্ত অংশ এভাবে শেখানো যায় না।
- পাঠক্রমের উপর ভিত্তি করে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়না ফলে অনেক ফাঁক থেকে যেতে পারে।
- গণিত প্রভৃতি বিষয়গুলি শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শেখানো কঠিন।
- অত্যন্ত ব্যয়বহুল, সহজলভ্যও নয়।
- শিক্ষক কিছুটা নিষ্ক্রিয় হয়ে উঠতে পারেন।
- পরীক্ষার সময় কিছুটা অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে।

৫.৪.২ অপ্রতিফলিত শিক্ষণ প্রকরণ (Non-projected Teaching Aids)

যে সমস্ত অপ্রতিফলিত শিক্ষণ-প্রকরণ সাধারণত ব্যবহৃত হয় তার কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হল।

মানচিত্র (Map)—ভূগোল ও ইতিহাস শিক্ষার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণ। মানচিত্রাঙ্কন বিদ্যার নিয়ম মেনে স্থান, নদী, পর্বত ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় ছাড়াও, জনঘনত্ব, উৎপাদিত শস্য, কলকারখানা, ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় মানচিত্রের মাধ্যমে শেখা যায়। ঐতিহাসিক স্থানগুলির বর্তমান অবস্থান, রাজ্যের পরিধি ইত্যাদি তথ্য ছাড়াও ইতিহাসের ঘটনাবলী ব্যাখ্যায় মানচিত্রের বিশেষ ভূমিকা আছে।

ছবি ও ফটো (Picture and Photograph)—শিক্ষণ প্রকরণ হিসাবে slide-এর যে ভূমিকা, ছবি ও ফটো সেই একই ভূমিকা গ্রহণ করে। হাতে আঁকা ছবি হলে, ইচ্ছামত বিষয় নির্বাচন, আকৃতি, মাধ্যম, এবং উদ্দেশ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে ঠিক যা দরকার সেরকম ছবি শিক্ষকরা এঁকে বা আঁকিয়ে নিতে পারেন। ফটোর ক্ষেত্রে আঁকা ছবির মত এতটা স্বাধীনতা না থাকলেও ফটোর বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বেশি। কারণ ফটোকে সকলেই বাস্তবের প্রতিভূ বলে মনে করে। যে কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রেই ছবি ও ফটো শিক্ষণ প্রকরণ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ছবি ও ফটোর সুবিধা হল—

- ব্যয়বহুল নয়।
- সহজলভ্য।
- রঙীন ও আকর্ষণীয়।
- সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা সহজ।
- বার বার ব্যবহার করা যায়।

কমিক্ ও কার্টুন (Comics and Cartoons)— রেখাচিত্রের ধারাবাহিক অবস্থানের সাহায্যে নামমাত্র কথা বা বর্ণনা ব্যবহার করে কোনো ঘটনাকে তুলে ধরার পদ্ধতিকে বলে কমিক্। ইতিহাস ও সাহিত্যের বর্ণনার ক্ষেত্রে কমিক্ একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম। রেখাচিত্রের সাহায্যে তির্যকভাবে কোনো বিশেষ তাৎপর্য বিশিষ্ট বক্তব্য প্রকাশ করার পদ্ধতিকে বলে কার্টুন। কার্টুন সচল ও সবাক হলে তাকে প্রতিফলিত প্রকরণ শ্রেণিভুক্ত করা হয়। যে পদ্ধতিতে কম্পিউটারের সাহায্যে স্থির চিত্রকে সচল হিসাবে দেখানো হয়, তাকে বলা হয় এ্যানিমেশান (Animation)। সাধারণত এই ধরনের চিত্র কৌতুকপূর্ণ হয়ে থাকে। এই দুই প্রকরণের সুবিধা হল—

- শিশুদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়।
- কার্টুন ও কমিক্ চরিত্রগুলির সঙ্গে শিশুরা খুব সহজেই একাত্ম হতে পারে এবং খুব দ্রুত যে কোনো বিষয় শিখতে পারে।
- বর্তমান কালে কার্টুন ও কমিক্ শিক্ষার শক্তিশালী বাহন হিসাবে গণ্য।
- এর মাধ্যমে রসবোধ ও সৃজনশীলতার বিকাশ হয়।

কিন্তু প্রধান সমস্যা এই যে, শিশুরা অতি সহজেই কমিক্ ও কার্টুনে আসক্ত হয়ে পড়ে তখন অন্য মাধ্যম কাজ করতে চায় না। তাছাড়াও অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় কোনো শিক্ষকের পক্ষে ইচ্ছামত কার্টুন বা কমিক্ তৈরি করা সম্ভব নয়। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নির্মিত কমিক্ ও কার্টুন অনেক সময়ই নিম্নরুচি ও ভুল শিক্ষার কারণ হয়।

লেখচিত্র ও চার্ট (Graphs and Chart)—কোনো সংখ্যাগত বিষয় বোঝানোর জন্য লেখচিত্র ব্যবহার করা হয়। চার্ট যে কোনো বিষয়ের উপর তৈরি করা যায়। লেখচিত্রের সাহায্যে হ্রাস-বৃদ্ধি (যেমন, জনসংখ্যার ক্রমিক বৃদ্ধি), তুলনা (যেমন, বিভিন্ন স্থানের বা দিনের বৃষ্টিপাতের তুলনা), অনুপাত (যেমন, নানাপ্রকার উৎপাদিত ফসলের অনুপাত) ইত্যাদি প্রকাশ করার জন্য নানা ধরনের লেখচিত্র তৈরি করা হয়। বারচিত্র (Bar diagram), পাইচিত্র (Pie Diagram) বহুভুজ (Polygon) ইত্যাদি লেখচিত্রের উদাহরণ। অন্যদিকে চার্ট হল

কোনো বড় কাগজে বক্তব্য বিষয়ের সারকথা, তথ্য, পরিসংখ্যা ইত্যাদি দৃশ্যগোচরভাবে তুলে ধরার উৎকৃষ্ট উপায়।

এই প্রকরণগুলির সুবিধা :

- শিক্ষক নিজেই তৈরি করে নিতে পারেন।
- সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট এবং বাছাই করা তথ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হয়।
- সংক্ষিপ্ত হওয়ায় এবং দৃশ্যগোচর হওয়ায় সহজেই মনে রাখা যায়।
- শিক্ষককে বার বার বোর্ডে লিখে সময় নষ্ট করতে হয়না।
- নানা রঙের ব্যবহারের ফলে আকর্ষণীয়।
- শ্রবণ সমস্যাযুক্ত শিক্ষার্থীদের পক্ষে উপযুক্ত।

অসুবিধার মধ্যে প্রধান হল, ছোটোদের পক্ষে এই প্রকরণ অনুপযোগী। সমস্ত বিষয়কেই চার্ট এ প্রকাশ করা যায় কিন্তু লেখচিত্রের সাহায্যে নয়। তাছাড়া শিক্ষকের পক্ষে কিছুটা দক্ষতা না থাকলে ভালো চার্ট তৈরি করতে হলে তাকে অন্য শিল্পীর সাহায্য নিতে হয়। তবে একবার তৈরি হয়ে গেলে তখন আর সমস্যা থাকেনা, বার বার ব্যবহার করা যায়। খুব বেশি ব্যবহার করলে এই প্রকরণ একঘেয়ে মনে হয়, তখন আকর্ষণ হারায়।

লেখচিত্র ও চার্ট (যেমন, জীববিজ্ঞানের পাঠে ব্যবহৃত চার্ট, রসায়নের ক্লাসে ব্যবহৃত চার্ট ইত্যাদি) দৃষ্টিগোচর আলোকিত জায়গায় টাঙানো দরকার এবং যথেষ্ট বড় হওয়া দরকার।

৫.৫ ❑ শিক্ষণ প্রকরণ হিসাবে কম্পিউটারের ব্যবহার (Use of Computer as Teaching Aid)

বর্তমানে শিক্ষণ প্রকরণ হিসাবে কম্পিউটার অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পূর্ববর্তী সমস্ত শিক্ষণ প্রকরণগুলির নির্মাণ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন প্রতিক্ষেত্রেই এখন কম্পিউটার অগ্রগণ্য হাতিয়ার। কম্পিউটার প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি ঘটায় বর্তমানে অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন নানাধরনের কম্পিউটার ব্যবহারের জন্য পাওয়া যায় (যেমন, সুপার কম্পিউটার, মেন ফ্রেম, মিনি কম্পিউটার, মাইক্রো কম্পিউটার ইত্যাদি)।

কম্পিউটারের কার্যপ্রণালী (Mechanism of Functioning of Computer)—কম্পিউটারের প্রধান চারটি একক বা উপাদান আছে।

কম্পিউটার হার্ডওয়ার (Computer Hardware)

- ইনপুট একক (Input Unit)—বিভিন্ন ভাষায় (Computer Language) তথ্য প্রতিক্রিয়াকরণ ও তাকে সংরক্ষণোপযোগী করা।
- স্মৃতি (Memory)—গণনা করা বা প্রতিক্রিয়ার পর তথ্য সংরক্ষণ করা।
- প্রক্রিয়াকরণ একক (Processing Unit)—নির্দেশের অর্থকে রূপান্তরিত করা এবং নির্দেশটি কার্যকর করা।

- আউটপুট একক (Output Unit)—প্রয়োজনীয় তথ্যকে প্রদর্শন করা (Monitor) এবং দরকার হলে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা।

কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ এককের বিভিন্ন অংশ এবং কাজ (Different Parts of Central Processing Unit and Their Function)

- নিয়ন্ত্রণ একক (Control Unit)—তথ্যের যোগান বজায় রাখে।
- গণিত ও যৌক্তিক একক (Arithmetic & Logic Unit)—গণনা ও সংখ্যা সংক্রান্ত কাজ করে।
- স্মৃতি (Memory)—মূল বা প্রাথমিক স্মৃতি (Primary Storage), ROM (Read only Memory) এবং RAM (Random Access Memory), Secondary Memory (Floppy Hard Disc এ সংরক্ষিত স্মৃতি)। আউটপুট যন্ত্র (Monitor এবং Printer)।

কম্পিউটার সফ্টওয়ার (Computer Software)—বিভিন্ন প্রোগ্রামের সমাহার কম্পিউটারের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে। এদের একযোগে বলা হয় software যা নানা নামে ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য পাওয়া যায়।

কম্পিউটারের ভাষা (Computer Language)—কম্পিউটারের হার্ডওয়ার যে ভাষায় কাজ করে তাকে বলা হয় নিম্নস্তরের ভাষা (Low Level Language) আর যে ভাষায় প্রোগ্রামগুলি কাজ করে (নির্দেশ গ্রহণ করা, নির্দেশমত কাজ করা) সেগুলিকে বলে উচ্চস্তরের ভাষা (High Level Language) এই ভাষার ভিত্তি ইংরাজী এবং সহজবোধ্য।

প্রোগ্রাম-এর কয়েকটি ভাষা (Few Languages of Programme)

- FORTRAN — Formula Translation
- COBOL — Common Business Oriented Language
- BASIC — Beginner's All Purpose Symbolic Instruction Code

এছাড়াও আছে PASCAL, ADA, LISP, ALGOL ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতির সফ্টওয়ার (Operating System Software)—WINDOWS, M S DOS, UNIX, LINUX ইত্যাদি।

শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটারের প্রয়োগ (Application of Computer in Education)—শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার ব্যাপক। শিক্ষণ প্রকরণ হিসাবে ব্যবহারকে এককথায় কম্পিউটার সহযোগে নির্দেশদান এই নামে পরিচিত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগের ভিত্তিতে বিভিন্ন সময়ে এর অনেক প্রকারভেদ ঘটেছে। যেমন,

- Computer Aided Instruction — CAI
- Computer Assisted Learning — CAL
- Computer Based Training — CBT
- Computer Managed Instruction — CMI
- Computer Mediated Education — CME ইত্যাদি।

শিক্ষকরা উপরোক্ত প্রয়োগগুলির ক্ষেত্রে যে সব কাজ করেন তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

- পাঠ্যক্রম তৈরি করা (Development of Curriculum)
- পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Planning)
- অভীক্ষা নির্মাণ ও প্রয়োগ (Testing and Test Construction)
- মূল্যায়ন (Evaluation)
- নির্দেশদান ও শিক্ষণ (Instruction & Teaching)

শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ (Applications in Teaching)

- প্রতিকল্প শিখন ও শিক্ষণ (Simulated Learning and Teaching)
- অসদ্গবেষণাগার ও অসদ্বাস্তব (Virtual Laboratory and Virtual Reality) সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষা।
- অনুশীলন (Exercise)
- প্রদর্শন (Demonstration)
- অন্য সমস্ত ধরনের শিক্ষণ প্রকরণের নির্মাণে প্রয়োগ
- তথ্য প্রদান, সংরক্ষণ ও সৃজন

এই বিষয়গুলি ব্যাপক। বিশদভাবে পড়ার জন্য শিক্ষাপ্রযুক্তি বিজ্ঞানের মূল গ্রন্থগুলি পড়া প্রয়োজন।

৫.৬ ❑ প্রথাগত ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষণ (Formal and Nonformal Education)

নির্দিষ্ট সময়ে, পূর্ব নির্ধারিত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গো যুক্ত হয়ে, শিক্ষকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষাগ্রহণ করে এবং শিক্ষা শেষে অন্য সকলের সঙ্গো একই মানের মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে ধাপে ধাপে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাকে প্রথাগত শিক্ষা বলে। বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথাগত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে একই শিক্ষক বছরের পর বছর ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করেন, পরীক্ষা গ্রহণ করেন, শংসাপত্র প্রদান করেন এবং এইভাবেই নির্দিষ্ট কয়েক বছরে শিক্ষার্থীরা এক একটি স্তরের শিক্ষা শেষ করে পূর্ববর্তী সমস্ত আলোচনার লক্ষ্য ছিল প্রধানত প্রথাগত শিক্ষা।

কিন্তু নানা কারণে সমস্ত দেশেই বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন না অথচ তাঁরা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী। এদের জন্য অপেক্ষাকৃত নমনীয় যে শিক্ষা ব্যবস্থা তাকেই এককথায় বলা হয় প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা। প্রকৃতপক্ষে পেশাগত দিক থেকে প্রথাগত শিক্ষার চেয়েও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার ব্যাপকতা বেশি। প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। যথা,

- নমনীয়তা (Flexibility)—নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম, সময় ও মূল্যায়ন সব কিছুর ক্ষেত্রেই নমনীয়তা আছে।
- বয়স (Age)—কোনো বয়সসীমা নেই। যে কোনো সময় শুরু বা শেষ করা যায়।
- প্রয়োজন ভিত্তিক (Need based)—যার যেমন প্রয়োজন তেমন শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।

- যোগ্যতা (Eligibility)—কোন ধরা বাঁধা যোগ্যতার মান নেই।
- উপকরণ (Equipments)—উপকরণ যথাসম্ভব কম ও সহজলভ্য সাধারণ উপকরণ।
- শিক্ষক (Teacher)—কোন স্থায়ীভাবে নিয়োজিত শিক্ষক না হলেও চলে।
- প্রেষণা (Motivation)—স্বেচ্ছায় শিখতে আসার দরুণ প্রেষণাজনিত কোন সমস্যা নেই।

প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা প্রযুক্তি (Technology of Nonformal Education)

শিক্ষা প্রযুক্তির কার্যক্ষেত্র প্রথাবহির্ভূত শিখনের ক্ষেত্রেও বিস্তৃত। প্রথাবহির্ভূত শিখনের জন্য প্রযুক্তি যে কোন পর্যায়েই ব্যবহার করা হয়। কয়েকটি উদাহরণ হল—

- শিখনের ও শিক্ষণের উপকরণ হিসাবে চার্ট, মডেল, চলচ্চিত্র ইত্যাদি নির্মাণ।
- শিখনের পদ্ধতি হিসাবে প্রযুক্তির ব্যবহার।
- শিখনের অগ্রগতি সম্বন্ধে তথ্য সংরক্ষণ ও তার ব্যবহার।
- একই বিষয় যাতে বহু মানুষকে শেখানো যায়, তারজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। এই কাজে রেডিও, টেপরেকর্ডার ভিডিও, রঙিন টেলিভিশন ইত্যাদি খুবই কার্যকর। (যেমন, রেডিওতে কৃষিকথার আসর, ডাক্তার ও চিকিৎসা সংক্রান্ত অনুষ্ঠান ইত্যাদি)।
- সহজ ও সচিত্র পুস্তিকা প্রণয়ন।
- পেশার সঙ্গে শিক্ষার সংযুক্তিকরণ ইত্যাদি।

৫.৭ ❑ দূরশিক্ষা ও পত্রাচার শিক্ষা (Distance Education and Correspondance Education)

দূরশিক্ষার আদিপূর্বে ডাকযোগে শিক্ষা বা পত্রাচার শিক্ষার প্রচলন ছিল। তখন অসংগঠিতভাবে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানিক উদ্যোগে কোনো বিশেষ পাঠ্যক্রমভিত্তিক পাঠ দেওয়া হত। ডাকযোগে পাঠ্য বিষয় পাঠিয়ে দিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্বও চলে ডাকযোগে। শেষে পরীক্ষা দিয়ে পাঠ শেষ করতে হত। পরবর্তীকালে আরও সংগঠিতভাবে, এই উদ্দেশ্যে আলাদা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে নিয়ম নীতি মেনে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তারই সাধারণ নাম দূরশিক্ষা (Distance Education) আর এইভাবে শেখার প্রক্রিয়াকে বলা হয় (Distance Learning)। দূরশিক্ষা পত্রাচার শিক্ষার বিলোপ ঘটিয়েছে একথা বলা যায়।

দূরশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি দুইপ্রকার, প্রচলিত প্রতিষ্ঠানের একটি অংশকে দূরশিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া (যেমন, কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা বিভাগ) আর নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তার হাতে দায়িত্ব দেওয়া। যেমন,

- Indira Gandhi National Open University
- Netaji Subhas Open University
- National Open School
- Rabindra Mukta Vidyalay ইত্যাদি।

লক্ষণীয় বিষয় প্রতিটি বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বে মুক্ত (Open) কথাটি ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে মুক্ত ব্যবস্থা ও দূরশিক্ষার মধ্যে অল্প কিছু পার্থক্য আছে। মুক্ত ব্যবস্থা আরও বেশি নমনীয় এবং ব্যাপক। এখানে মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থাটিকেই প্রধানভাবে আলোচনা করা হচ্ছে কারণ, এর মধ্যেই দূরশিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলিও বলা হবে।

মুক্ত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য—

- মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে UGC অনুমোদিত এবং বিদ্যালয়স্তরে রাজ্য সরকার অনুমোদিত।
- শিক্ষার স্তরগুলি সাধারণ শিক্ষার স্তরের মতই। এরফলে যে কোনো স্তরে শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে অথবা বিপরীত ক্রমে মুক্তশিক্ষায় যোগ দিতে পারে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্ভর নয়। প্রধানত বাড়িতে পড়া চলে। তবে কোনো পাঠকেন্দ্রে নাম নথিভুক্ত করাতে হয়।
- পাঠকেন্দ্র থেকে পাঠ্যবিষয় (Course material) বিতরণ করা হয়, অভিজ্ঞ শিক্ষকদের পরামর্শ (Counseling) পাওয়া যায়, কিছু কিছু পাঠও নেওয়া যায়, এবং পাঠকেন্দ্রেই পরীক্ষা দেওয়া যায়।
- শিক্ষার্থী তৈরী হওয়ার পর নিজেদের পছন্দমত সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরীক্ষায় বসতে পারে। অর্থাৎ একবারে পাশ করতে না পারলে বাকি অংশ আবার পরীক্ষা দিতে পারবে।
- পাঠকেন্দ্র মারফৎ যে সব কৃত্য (Assignment) করণীয় থাকে তার মূল্যায়ন হয়।
- কোনো বয়ঃসীমা নেই।
- সাধারণত বছরে দুইবার শুরু করার সুযোগ দেওয়া হয়।
- শিক্ষার গুণমান উন্নত। কারণ পাঠ্যপুস্তকগুলি বিশেষ পদ্ধতিতে মডিউল অনুযায়ী স্বশিক্ষার উপযোগী করে লিখিত হয়।

দূরশিক্ষার প্রতিষ্ঠান National Council of Distance Education-এর মান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় সারাদেশে এর মান একইরকম।

দূরশিক্ষার সমস্যাও কিছু কিছু আছে। যেমন,

- শিক্ষার্থীরা স্বশিক্ষার মানসিকতা নিয়ে যোগদান না করায়, শিক্ষক নির্ভর হয়ে পড়েন।
- যথেষ্ট সংখ্যক পরামর্শদাতার অভাব দেখা যায়।
- পরিচালন ব্যবস্থা বেশ জটিল।
- প্রতিষ্ঠানিক ব্যয়, মাথাপিছু ব্যয় কম নয়। সরকারকে সবসময়ই ভর্তুকি দিতে হয়।

কিছু কিছু সমস্যা সত্ত্বেও বর্তমানে দূরশিক্ষা তথা মুক্তশিক্ষা একটি অপরিহার্য ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাও যথারীতি প্রযুক্তি নির্ভর।

৫.৮ ❑ সারসংক্ষেপ (Summary)

শিক্ষণ প্রকরণ মূলতঃ শিক্ষকের কাজকে সহজ কিন্তু ফলপ্রসূ করার জন্য প্রয়োজন। প্রকরণের ব্যবহার শিক্ষামনোবিজ্ঞানে আলোচিত শিখনের আচরণবাদীতত্ত্ব ও প্রজ্ঞাবাদীতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। নানাধরনের প্রকরণের মধ্যে প্রতিফলিত প্রকরণ যেমন, Slide, Film Strip চলচ্চিত্র ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অপ্রতিফলিত প্রকরণের মধ্যে আছে। চার্ট, মানচিত্র, লেখচিত্র ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র সুবিধা অসুবিধা আছে। বর্তমানে কম্পিউটারও প্রকরণ হিসাবে শিক্ষণের ক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজনীয়। প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা, দূরশিক্ষা ও মুক্তশিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযুক্তি ও প্রকরণের ব্যবহার অপরিহার্য।

৫.৯ ❑ প্রশ্নাবলি (Questions)

১। শিক্ষা প্রকরণ কাকে বলে?

২। শিক্ষা প্রকরণের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। গ্যানের শিখনের স্তরগুলি উদাহরণসহ বিশদভাবে আলোচনা করুন।

৪। শিখনের প্রকরণ কয়প্রকার ও কি কি?

৫। প্রতিফলিত প্রকরণগুলির বিবরণ দিন। এদের বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করুন।

৬। অপ্রতিফলিত প্রকরণগুলির নাম এরকম হল কেন? অপ্রতিফলিত প্রকরণগুলির সুবিধা, অসুবিধা ও প্রয়োগ বর্ণনা করুন।

৭। কম্পিউটারের গঠন ও ভাষা সম্বন্ধে বিবরণ দিন।

৮। কম্পিউটারে প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করুণ। কেন কম্পিউটারকে শিক্ষণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলা হয়?

৯। প্রথাগত ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার পার্থক্য কি? প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা দিন।

১০। দূরশিক্ষা ও পত্রাচার শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য কি? মুক্ত শিক্ষা কাকে বলে? মুক্ত শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

Agarwal, J. C. (2002) Essentials of Educational Technology : Teaching Learning Innovating in Education, New Delhi, Vikash Publishing.

Benghort, F. W (1969) Educational Systems Analysis, London, Mc Millon

Bhatt and Sharma S. R. (1992) Educational Technology, New Delhi Krishna Publishing House, 1992,

Bhattacharya N. K. and Roy, A (2003) : Education, Paper–IV, Tripura University, Directorate of Distance Education), Tripura.

Bloom, R. S (1974) Taxonomy of Educational objectives, Mckay Co. Newyork

মলয় কুমার সেন (২০০৪)। শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞান, সোমা বুক এজেন্সি, কলকাতা

Kumar, K. L. (1996) Educational Technology, New Delhi, New Age International (P) Limited

Rao. U (1997) Educational Technology, Mumbai Himalya Publishing House.

একক ৬ ❑ পাঠক্রমের ধারণা (Concept of Curriculum)

গঠন

৬.১ সূচনা

৬.২ উদ্দেশ্য

৬.৩ পাঠক্রমের ধারণা

৬.৪ পাঠক্রমের সংজ্ঞা

৬.৫ পাঠক্রম সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী

৬.৬ পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য

৬.৭ পাঠ, পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রম

৬.৮ পাঠক্রমের প্রকারভেদ

৬.৮.১ গতানুগতিক বা বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রম

৬.৮.২ কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম

৬.৮.৩ অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রম

৬.৮.৪ অবিচ্ছিন্ন বা সমাকলিত পাঠক্রম

৬.৮.৫ জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম

৬.৯ শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠক্রমের ভূমিকা

৬.১০ উপসংহার

৬.১১ প্রশ্নাবলি

৬.১ সূচনা (Introduction)

শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ ও উন্নয়নে সাহায্য করা। শিক্ষার এই লক্ষ্যে পৌছতে যে তিনটি প্রধান উপাদান দরকার সেগুলি হল—শিক্ষার্থী, পাঠক্রম ও শিক্ষক। এই পাঠক্রম ব্যক্তি ও সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়বস্তু শিক্ষণ-প্রক্রিয়া এবং

মূল্যায়ন-প্রক্রিয়া সংগঠিত করে। দেশ, কাল ও দার্শনিক মতবাদের ভিত্তিতে এই পাঠক্রমের প্রকারভেদেরও বিভিন্নতা দেখা যায়। আসলে পঠনপাঠন কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার সুপরিকল্পিত পন্থার পাঠক্রমকে অনেকে আবার বিষয়বস্তুর সমাহার বলে অভিহিত করে থাকেন। এই এককে পাঠক্রমের একটি সামগ্রিক ধারণা গড়ে তোলা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কীভাবে বিভিন্ন প্রকারের পাঠক্রম সৃষ্টি ও ব্যবহৃত হয় ইত্যাদি বিষয়ের একটি রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

৬.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে, শিক্ষার্থীরা—

- পাঠক্রমের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- পাঠক্রম সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- পাঠক্রমের প্রকারভেদের সম্যক ধারণা লাভ করবেন।
- শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠক্রমের ভূমিকার রূপরেখা টানতে পারবেন।

৬.৩ পাঠক্রমের ধারণা (Concept of Curriculum)

শিক্ষা কার্যক্রমের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পাঠক্রম। শিক্ষা কার্যক্রমে লক্ষ্য নির্ধারণ হওয়ার সঙ্গো সঙ্গো জানা দরকার কার্যক্রমে পাঠক্রমটি কী হবে? এই পাঠক্রমই শিক্ষার্থীকে শিক্ষার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। আসলে উপযুক্ত পঠনপাঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর সুপরিকল্পিত গতিশীল প্রক্রিয়া হচ্ছে পাঠক্রম। অনেকে পাঠক্রমকে 'জ্ঞান সামগ্রী' বলে থাকেন।

বাংলায় যে কথাটিকে বলা হয় 'পাঠক্রম' ইংরেজিতে সেটিই হল কারিকুলাম (curriculum)। ব্যুৎপত্তিগত দিক আবার অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে ইংরেজি কারিকুলাম শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ CURRER থেকে। যার অর্থ হচ্ছে দৌড় (RACE)। আর কারিকুলাম (CURRICULUM)

শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল—বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছানোর গতিপথ (course to be run for reaching a certain goal) অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে 'কারিকুলাম' কথা ব্যবহার করে শিক্ষা কার্যক্রমকে দৌড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয় যার শেষ পর্যায় হল শিক্ষার লক্ষ্য (aim of education)। শিক্ষা কার্যক্রমের পাঠক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিতভাবে পূর্বনির্ধারিত গতিপথের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ পাঠক্রম হল শিক্ষার সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছানোর গতিপথ।

মধ্যযুগে 'পাঠক্রম'-কে 'জ্ঞানভিত্তিক' ধারণা হিসেবেই বিবেচিত করা হত। ফলে প্রাথমিক পর্বে পাঠক্রম গুরুত্ব পেয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে তাত্ত্বিকজ্ঞানের ও তার বিন্যাসের ওপর। কিন্তু পরবর্তীকালেও দার্শনিক ভিত্তির সঙ্গে পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষার লক্ষ্য, মনোবৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে শিক্ষার লক্ষ্য যেমন জীবনাদর্শ ও সমাজদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তেমনি 'পাঠক্রম' আবার শিক্ষার্থী ও শিক্ষাকে ব্যক্তিসত্তা, প্রকৌশল ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সুনিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়ে থাকে। আর এই সমস্ত উপাদান ও পরিমণ্ডল একে অন্যের পরিপূরক হয়ে শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে, তাই পাঠক্রম একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। উপযুক্ত গতিশীল পাঠক্রমই পরিবর্তনশীল পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তির চাহিদার পরিতৃপ্তির মাধ্যমে ব্যক্তির জীবনের গুণগতমানের উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে থাকে।

পাঠক্রম নিয়ে শিক্ষাবিদরা বিভিন্নভাবে চিন্তাভাবনা করেছেন। তবে চতুর্দশ শতাব্দীতে শিক্ষাবিদদের গবেষণার ক্ষেত্রে এর বিশেষ গুরুত্বলাভ ঘটে। এই সময়ে গ্রিক দার্শনিক প্লেটো (Plato) পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ দিয়েছিলেন। পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে কমিনিয়াস (Comeneius) এই মতবাদের উপযুক্ত প্রয়োগ পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে ঘটান। পরবর্তীকালে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে রাস্ক (Rusk), ফ্রয়েবেল (Froebel) প্রমুখ শিক্ষাবিদরা পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে নানান বিষয় ও সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করেন। অবশ্য পাঠক্রম প্রস্তুতির ক্ষেত্রে উনবিংশ (১৭৭৬-১৮৪১) শতাব্দীতে হার্বার্ট (Herbert) এর মতবাদ ও তত্ত্ব এক নতুন দিকের সূচনা করে। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে পাঠক্রমের উন্নয়ন ও পর্যালোচনার ওপর শিক্ষাবিদরা বিশেষ গুরুত্ব দেন। তার জন্য দেশে ও বিদেশে নানা শিক্ষা কমিশন হয়। এইসব কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পরিবর্তনশীল আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে শিক্ষার মূল লক্ষ্য, মূল কাঠামো, পরিচালনা ব্যবস্থা স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তন ঘটেছে কারিকুলাম-এর ধারণাগত ভিত্তি ও বাস্তব রূপায়ণ প্রক্রিয়ার।

৬.৪ পাঠক্রমের সংজ্ঞা (Definition of Curriculum)

'পাঠক্রম' নিয়ে নানা বিশেষণ শিক্ষাবিদরা করেছেন। আর সেইমত শিক্ষাবিদরা ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। এরকম কয়েকটি সংজ্ঞা নীচে উল্লেখ করা হল—

(১) ফ্রয়েবল (Froebel) বলেছেন, পাঠক্রম হচ্ছে মানবজাতির সার্বিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার এক সমন্বয়ী রূপ (curriculum should be conceived as an epitome of the rounded whole of the knowledge and experience of the human race.)

(২) পেনি (Payne)-এর মতে, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূলে বিদ্যালয়ে সচেতনভাবে পরিবেশ ও কার্যক্রম সংগঠিত করা হয় তাদের সমবায়ই হল কারিকুলাম (curriculum consists of all the situations that schools may select and consciously organise for purpose of developing the personality of its pupils and for making behaviour changes in them.)

(৩) অ্যানয়মাস (Anoymous) বলেছেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পঠনপাঠনের বিষয়বস্তু, কাজকর্ম ও অভিজ্ঞতার কার্যকরী সমন্বয়ই হল পাঠক্রম।

(৪) ক্রো এবং ক্রো (Crow and Crow) বলেছেন, শিক্ষার্থীর মানসিক, দৈহিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের অন্তর্গত ও বহির্ভূত যে সহায়ক অভিজ্ঞতাপুঞ্জ নির্বাচন করা হয় তাই হল পাঠক্রম (curriculum includes all the learner's experience, in or outside school that are included in programme which has been devised to help him to develop mentally, physically, emotionally, socially, spiritually and morally).

(৫) এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে বলা হয়েছে যে কারিকুলাম হল বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সে শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্টমানের অনুসৃত জ্ঞানমূলক পাঠ্যবিষয়ের সমবায় (Curriculum : A course of study laid down for the students of a university or school, or in a wider sense, schools of certain standard.)।

(৬) মুদালিয়র কমিশন (Mudeliar Commission)-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, পাঠক্রমকে শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এটাকে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ধরনের কাজের সব অভিজ্ঞতার সমন্বয় যেমন—শ্রেণিকক্ষের, পাঠাগারের, পরীক্ষাগারের, কর্মশালায়, খেলার মাঠের অথবা শিক্ষার্থীর সঙ্গো শিক্ষকের মিথস্ক্রিয়ার সমবায় হিসেবে ভাবা সঠিক

(curriculum does not mean only the academic subjects traditionally taught in schools but it includes the totally of experiences that a pupil receives through the manifold activities that go on schools–in the classroom library, laboratory, workshop, playground and numerous informal contacts between teachers and pupil.)

ভারতে ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষা কমিশন অনুযায়ী পাঠক্রমকে মানবসম্পদ উন্নয়নের মূলভিত্তি হিসেবে বিবৃত করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে পাঠক্রমের দুটি উদ্দেশ্য-এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রথম উদ্দেশ্যটি হল, শিক্ষার্থীর পূর্ণ বিকাশ, উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা (Human resource development)। দ্বিতীয়টি হল, শিক্ষার্থীর সামাজিক ও বাস্তব প্রয়োজনের নিরিখে উপযুক্ত পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার সন্নিবেশ ঘটানো। এই দুটি উদ্দেশ্য একে অন্যের পরিপূরক ও পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

৬.৫ পাঠক্রম সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি (Traditional and Modern Approaches of Curriculum)

প্রাচীনকালে পাঠক্রমকে জ্ঞান ও তাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর সমাহার বলে বিবেচনা করা হত। তাই মধ্যযুগীয় চিন্তাধারায় পাঠক্রম বিশেষভাবে 'জ্ঞানভিত্তিক' লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রস্তুত করা হয়। এই সময় চিন্তাবিদরা মনে করতেন শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতার উন্নয়ন শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান দ্বারা সম্ভব। তাই পাঠক্রম প্রস্তুত করার সময় মানসিক বৃত্তি ও প্রবণতার বিকাশের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত জ্ঞান সামগ্রী নির্বাচন করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর চিন্তন ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তখন নীতিশাস্ত্র, অঙ্ক ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হয়। তেমনি যোগাযোগ ক্ষমতা ও সামাজিক অভিযোজনের উদ্দেশ্য ভাষা, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে জোর দেবার কথা বলে। আবার পরিবেশ ও সত্যকে জানার উদ্দেশ্যে এই ধরনের পাঠক্রমে বিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান আহরণ ও অনুশীলন প্রয়োজন বলে বিবেচিত।

প্রাচীনকালে শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করতেন মানুষের মন কতকগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ মানসিক ক্ষমতা বা শক্তি (faculty) দ্বারা গঠিত। পাঠক্রমের সাহায্যে মানুষের ক্ষমতা ও প্রবণতার বিকাশ ঘটানো সম্ভব। তাই পাঠক্রম প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এমনভাবে বিষয় নির্বাচন প্রয়োজন যার দ্বারা মানসিক ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব। শিক্ষা-সংক্রান্ত এই নীতিকে মানসিক শৃঙ্খলাবোধ নীতি বলা হয় (theory

of formal discipline)। অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য হল কেবলমাত্র বৌদ্ধিক বিকাশ। এই ধারণা অনুযায়ী পাঠক্রম হল শিক্ষা কার্যক্রমের জ্ঞানমূলক পাঠ্যবিষয়ের সমাহার।

প্রাচীন বা গতানুগতিক আদর্শে প্রস্তুত পাঠক্রম মানুষের ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক জীবনে বিশেষ কাজে লাগে না বলে আধুনিক শিক্ষাবিদরা এই পাঠক্রমের মূল ধারণাগত ভিত্তির বিশেষ পরিবর্তন ঘটান। আধুনিক চিন্তাবিদদের মতে পাঠক্রমকে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। আধুনিককালে চিন্তাবিদরা মনে করেন পাঠক্রম শুধুমাত্র জ্ঞানভিত্তিক না করে একদিকে যেমন ব্যক্তির বিকাশ ও উন্নয়নের উপর জোর দেবে অন্যদিকে শিক্ষার্থীর সামাজিক প্রক্রিয়াকরণেও জোর দেবে। তাই এই দুই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে পাঠক্রমের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করার সঙ্গে জীবন, জীবিকা ও সামাজিক অভিযোজনের উদ্দেশ্যে অন্যান্য অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটানো বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করা হয়। এই ধরনের সর্ব অভিজ্ঞতার সমন্বয়ই হল পাঠক্রম। তাই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পাঠক্রম শুধুমাত্র সংকীর্ণ জ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সীমাবদ্ধ নয়। এই পাঠক্রমকে ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক বিকাশে সহায়ক, (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে) উপাদান ও অভিজ্ঞতাপুঞ্জের সমন্বয় হিসেবে ধরা হয়।

পাঠক্রমের প্রাচীন ও আধুনিক ধারণা সম্বন্ধে আধুনিককালে শিক্ষাবিদরা ৫টি পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। এগুলো নিম্নের ছকে বর্ণনা করা হয়েছে—

প্রাচীন ধারণা	আধুনিক ধারণা
১। শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক বিকাশ শিক্ষার মূল লক্ষ্য।	১। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ ঘটানো শিক্ষার মূল লক্ষ্য।
২। উর্ধ্বক্রমে জ্ঞানমূলক বিষয়বস্তুই প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচিত।	২। পাঠক্রমের উপাদান হিসেবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত, সামাজিক, সৃজনীমূলক ও বৃত্তিমূলক কার্যাবলির সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন।
৩। পঠনপাঠন প্রক্রিয়া মূলত শিক্ষক নির্ভর।	৩। পঠনপাঠন প্রক্রিয়া মূলত শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমের ভিত্তিতে সংগঠিত করা।
৪। পাঠক্রম পূর্বনির্ধারিত ও অপরিবর্তিত।	৪। পাঠক্রম গতিশীল ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনশীল।
৫। পাঠক্রম তাত্ত্বিক আর্দশের ভিত্তিতে প্রস্তুত হওয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া যায়।	৫। পাঠক্রমের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর বাস্তব পরিবেশ ও জীবনকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সংযোজিত।

৬.৬ পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Curriculum)

প্রাচীন বা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে যেসব পাঠক্রম আজকের শিক্ষা কার্যক্রমে বিশেষভাবে সমাদৃত সেইসব পাঠক্রমে কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(১) পাঠক্রমের মূল কাঠামো শিক্ষার মূল লক্ষ্যের সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত। তাই পাঠক্রমে এমনভাবে বিষয়বস্তু, পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়সাধন করার চেষ্টা করা হয় যাতে পাঠক্রমটি শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের সহায়ক হয়ে ওঠে।

(২) পাঠক্রমের লক্ষ্য কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশে সীমাবন্ধ নয়। তার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গো সঙ্গো মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও জীবিকা অর্জনের সহায়ক উপাদানের বিন্যাস ঘটিয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন করা। তাই পাঠক্রমে এইসব বিভিন্ন উপাদানের কার্যকরী সমন্বয়সাধনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(৩) পাঠক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে পুথিগত বিদ্যা বা তাত্ত্বিকজ্ঞানের সঙ্গো শিক্ষার্থীর 'ব্যবহারিক জীবন ও সৃজনী প্রতিভার সঠিক মেলবন্ধন ঘটানো। অর্থাৎ পাঠক্রমে যেমন তাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর গুরুত্ব থাকবে তেমনি সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে তাত্ত্বিকজ্ঞানের সঙ্গো ব্যবহারিক উপযোগিতার ও নিজস্ব উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ওপর।

(৪) আধুনিক প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়ন, আর্থসামাজিক অবস্থা ও পরিবেশ, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, উন্নয়নের পরিবর্তনশীল গতি ও প্রেক্ষাপটে শিক্ষার লক্ষ্যের নিরন্তর বিবর্তন ঘটেছে। তাই পরিবর্তনশীল জগতে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের সহায়ক বিষয়বস্তু ও অভিজ্ঞতা নিরন্তর পাঠক্রমে সংযোজিত হয়। ফলে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির চাহিদার ভিত্তিতে পাঠক্রমের মূল ধারণার বিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ পাঠক্রম একটি প্রবাহমান ও গতিশীল প্রক্রিয়া।

(৫) পাঠক্রমের বিষয়বস্তুগুলো একে অন্যের সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত ও একে অন্যের পরিপূরক।

(৬) পাঠক্রমের সার্থকতা ও যৌক্তিকতা শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর ওপর বা তার শিখনের ওপর নির্ভর করে না। কোনো পাঠক্রমের সফলতা যেমন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল তেমনি শিক্ষার মূল লক্ষ্য, শিক্ষণের পরিবেশ, শিক্ষণ উপকরণ, সম্পদ, পন্ধতি, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সমানভাবে নির্ভরশীল। তাই কোনো পাঠক্রমের

কার্যকরী সফলতা আনার উদ্দেশ্যে সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে শিক্ষার মূল লক্ষ্য, বিষয়বস্তু উপকরণ, শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি, মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সমন্বয় ও মেলবন্ধন ঘটানো উচিত। ফলে জ্ঞানভিত্তিক পঠনপাঠন প্রক্রিয়ার চেয়ে আধুনিক 'পাঠক্রমের' সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি ব্যবহারিক উপযোগিতা ও যথার্থতা বৃদ্ধির সহায়ক।

(৭) পাঠক্রম শুধুমাত্র শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর উদ্যোগ ও প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে না। পাঠক্রমের সফলতা নির্ভর করে শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত বিভিন্ন লোকের ইচ্ছে, আগ্রহ ও অংশের ওপর শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের কার্যকরী অংশগ্রহণের সঙ্গে পাঠক্রমের সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষার নীতিনির্ধারক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, উপকরণ নির্মাতা ইত্যাদি নানান জনের ওপরে। এদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও কার্যকরী অংশগ্রহণ পাঠক্রমের স্থায়িত্ব ও উপযোগিতা বাড়াতে সাহায্য করে।

(৮) পাঠক্রমে যে সমস্ত বিষয়বস্তু ও অভিজ্ঞতার সংযুক্তিকরণ হয় তা সবসময় শ্রেণিকক্ষের পঠন-পাঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করা সম্ভব হয় না। তাই পাঠক্রমের কার্যক্রম শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ না রেখে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, সমাজ জীবনের অভিজ্ঞতা ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জন করা হয়। অর্থাৎ পাঠক্রমের অভিজ্ঞতাকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়—(১) শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা এবং শ্রেণিকক্ষের বহির্ভূত অভিজ্ঞতা।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে শিক্ষার মূল লক্ষ্য বিষয়বস্তু, উপকরণ, শিক্ষণ পদ্ধতি, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদানে সমৃদ্ধ ও নিরন্তর গতিশীল প্রক্রিয়াই হচ্ছে পাঠক্রম। পাঠক্রম শুধুমাত্র শিক্ষার্থী বা শিক্ষক নির্ভর কার্যক্রম নহে। এতে বহু ধরনের ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এরই পাশাপাশি মনে রাখা প্রয়োজন পাঠক্রমের সফলতা নির্ভর করে সঠিক পাঠ্যসূচি ও পাঠের ওপর।

৬.৭ পাঠ, পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রম (Lesson, Syllabus and Curriculum)

পাঠক্রম হল শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ। শিক্ষার লক্ষ্য দু-রকমের হতে পারে—চরম লক্ষ্য ও তাৎক্ষণিক লক্ষ্য। আমরা জানি শিক্ষার চরম লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটানো এবং এই উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো। এই চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব নয়। এর জন্য সুপরিকল্পিতভাবে ধাপে ধাপে এগোতে হয়। এই ধাপগুলোর জন্য নানা কোর্স

তৈরি করা হয়। এই কোর্সগুলোকে শিক্ষার তাৎক্ষণিক লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। আর সেইমতো নানা কোর্সের জন্য লক্ষ্য অনুযায়ী পাঠক্রম প্রস্তুত করার ওপর জোর দেওয়া হয়।

সাধারণত পাঠক্রমের যেসব বিষয় বা অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাকেই পাঠ্যসূচি বলা হয়। যেমন—ক্লাস ওয়ানে আমরা দেখি যে সেই পাঠক্রমে রয়েছে অঙ্কের পাঠ্যসূচি আর বাংলার পাঠ্যসূচি। এই পাঠ্যসূচিগুলিই ক্লাস ওয়ানের চরম লক্ষ্যের সহায়ক উপাদান। এই সমস্ত পাঠ্যসূচি ক্লাস ওয়ানের মূল পাঠক্রমের অংশবিশেষ।

পাঠ্যসূচি আবার বহু সংখ্যক একক পাঠের সমন্বয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকে। এই পাঠগুলি শিক্ষার তাৎক্ষণিক লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে নির্বাচন করা হয়ে থাকে। কয়েকটি তাৎক্ষণিক লক্ষ্যের ভিত্তিতে আবার পাঠ্যসূচির লক্ষ্য স্থির। স্বল্পমেয়াদী ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের এইসব পাঠ শেষ হলে পাঠ্যসূচির লক্ষ্যে পৌছানো যায় যা পরবর্তীকালে পাঠক্রমকে চরম লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করে।

নীচের চিত্রে পাঠ, পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রমের সম্পর্ক দেখানো হল ঃ—

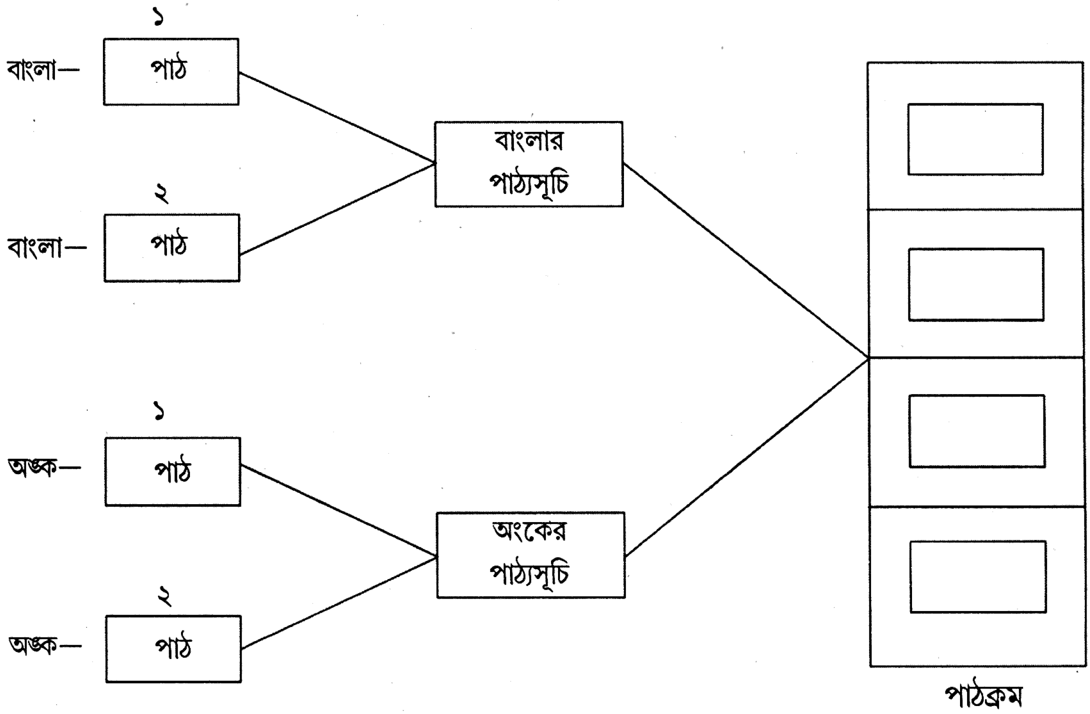

চিত্র ১.১ পাঠ → পাঠ্যসূচি → পাঠক্রম-এর সম্পর্ক।

চিত্র ১.১ পাঠ, পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রম পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো হল। পাঠ্যসূচি বহু সংখ্যক পাঠের সমষ্টি এবং পাঠক্রম কিছু সংখ্যক পাঠ্যসূচি ও কোনো কোনো সময় পাঠ্যসূচি বহির্ভূত অভিজ্ঞতার সমন্বয়। এই তিনটি স্তরে বিষয়বস্তু, সময়কাল লক্ষ্য অনুযায়ী গুণগত ও পরিমাণগত দিকে পার্থক্য রয়েছে। নীচের চিত্রে তা তুলনামূলকভাবে দেখানোর চেষ্টা করা হল।

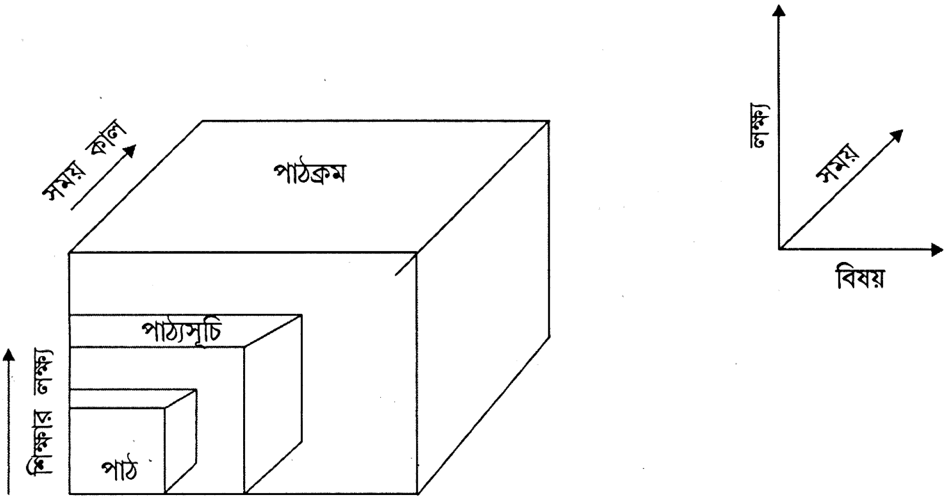

চিত্র ১.২ পাঠ, পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রমে শিক্ষার লক্ষ্য ও সময়কালের তুলনামূলক চিত্র।

ওপরের চিত্র থেকে আমরা দেখতে পাই পাঠক্রমের ধারণা হচ্ছে পাঠ ও পাঠ্যসূচির মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্য ও সময়কালকে সুপরিকল্পিতভাবে বিন্যাস ও সমন্বয়সাধন করার ওপর নির্ভর করছে। পাঠক্রমের লক্ষ্য, বিষয় ও সময়, পাঠ ও পাঠ্যসূচির লক্ষ্য, বিষয় ও সময়কালের ওপর নির্ভর করে।

৬.৮ পাঠক্রমের প্রকারভেদ (Types of Curriculum)

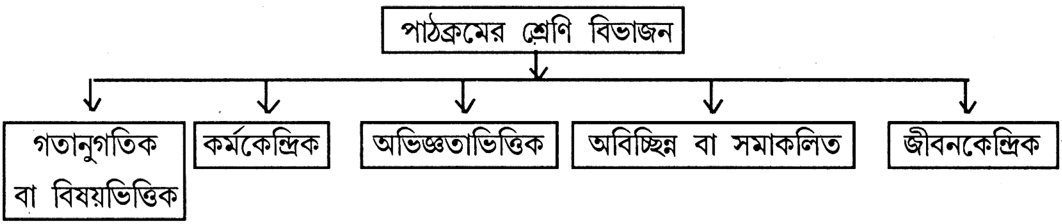

চিত্র ১.৩ পাঠক্রমের প্রধান শ্রেণি বিভাজন

প্রথাযুক্ত (formal) বা প্রথাবহির্ভূত (non formal) যে-কোনো শিক্ষা কার্যক্রমেরই একটি নিজস্ব লক্ষ্য থাকে। পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থা ও জীবন আর্দশের প্রেক্ষাপটে এই দুই শিক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও বিষয়বস্তুর নানা বিবর্তন ঘটেছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ও চাহিদা অনুযায়ী গড়ে উঠেছে নানা রকমের পাঠক্রম। ওপরের চিত্রে ১.৩ এই ধরনের পাঠক্রমের নমুনা দেখানো হল। নীচে এই প্রকারভেদগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

৬.৮.১ গতানুগতিক বা বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রম (Traditional or Subject Centred Curriculum)

বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রম সবচেয়ে পুরাতন ও বহুল ব্যবহৃত পাঠক্রম। সুদূর প্রাচ্যের গ্রিসে ও রোমে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই ধরনের পাঠক্রমের চিন্তাভাবনা ও প্রচলন শুরু হয়। এই পাঠক্রমে প্রধানত বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিষয়ভিত্তিক পাঠক্রমে শিক্ষকেরা পূর্ব নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান দান করেন আর ছাত্ররা শ্রেণিকক্ষের পঠনপাঠনের সাহায্যে এই জ্ঞান গ্রহণ করে থাকে। যুগযুগ ধরে প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে এই ধরনের পাঠক্রমের ব্যবহার হয়ে চলেছে। এই পাঠক্রমের সফলতা ছাত্রের জ্ঞান আহরণ করার গুণগতমানের ওপর নির্ভর করে। ফলে পাঠক্রমের সফলতা ছাত্রের স্মৃতি ও বুদ্ধি এই দুই মানসিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল।

এই ধরনের পাঠক্রমের ধারণাগত ভিত্তি প্রাচীন শিক্ষাবিদদের মতানুসারে মানসিক শৃঙ্খলা তত্ত্বের (Theory of formal discipline) ওপর নির্ভর। এই তত্ত্বে বিশ্বাসী শিক্ষাবিদরা মনে করেন মানুষের মন কতকগুলি প্রাথমিক বৃত্তি (Faculty) বা ক্ষমতা দিয়ে তৈরি। পাঠ্যবিষয়ের উপযুক্ত বিষয়বস্তু মনের কোনো বিশেষ ক্ষমতা বা বৃত্তিকে বিকাশ করতে সাহায্য করে। যেমন গণিত বা নীতিশাস্ত্রের ব্যবহার মানুষের যুক্তি শক্তির বিকাশের উৎকর্ষ হিসেবে কাজ করতে পারে। তেমনি পরিবেশ ও ভূগোল এর বিষয়বস্তু মানুষকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার বিকাশে সাহায্য করতে পারে। তা ছাড়া এই তত্ত্ব অনুযায়ী বিশেষ ধরনের পাঠের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মনের ক্ষমতার যে বিকাশ ঘটে তা শিক্ষার্থী জীবনের অন্য পরিস্থিতিতেও প্রয়োগ বা ব্যবহার করতে পারবে। অর্থাৎ এখানে মনে করা হয় কোনো বিশেষ পাঠের মাধ্যমে মনের কোনো ক্ষমতার বিকাশ হলে, সেই শক্তি (stimulus) সামগ্রিকভাবে মানসিক বিকাশ ঘটায় এবং এই লব্ধ মানসিক ক্ষমতাই শিক্ষার্থীর জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সমস্যা সমাধান ও মূল্যায়নে সাহায্য করে।

বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রমের কার্যকারিতা নির্ভর করে পাঠ্যসূচি ও পাঠের সংগঠনের ওপর। সার্থক পাঠক্রম তখনই প্রস্তুত সম্ভব যদি স্বল্প বিষয়বস্তুর মাধ্যমে সীমিত সময়ে সহজেই শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করা হয়। কতটা শেখানো হবে ও কী শেখানো হবে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে বিষয়বস্তুর সমন্বয় ঘটানো হয়। আর এই সমন্বয় ঘটাতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পাঠক্রমের সংগতি রেখে পাঠ ও পাঠ্যসূচির বিন্যাস ঘটানো হয়।

এই ধরনের পাঠক্রমের সুবিধা হচ্ছে সীমিত সময় ও স্বল্প সংখ্যক শিক্ষকের সাহায্যে অনেক বেশি ছাত্রের সহজে শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায়। শুধু তাই নয় একই সঙ্গে অনেক শিক্ষার্থীর মূল্যায়নও সম্ভব। এই ধরনের পাঠক্রম পরিকল্পনার সময় শিক্ষকেরা ভাষণ, আলোচনাচক্র ইত্যাদির মাধ্যমে কার্যক্রম সহজে পরিচালনা করে থাকেন।

● বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রমের ত্রুটি (Defects of Subject Centred Curriculum)

বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রম যেহেতু বহুল ব্যবহৃত পাঠক্রম তাই এই নিয়ে নানা গবেষণা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ের শিক্ষা কমিশন এই ধরনের পাঠক্রমের ত্রুটি নির্ণয় করে পরিমার্জন, সংশোধন ও পরিবর্ধনের ওপর নানা নীতি ও নির্দেশিকা দান করেছেন। নীচে এইসব ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো নিয়ে আলোচনা করা হল—

(১) এই ধরনের পাঠক্রম বিষয়বস্তুর ভারে ভারাক্রান্ত থাকে। শুধু তাই নয় শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট সময়ে ও অনেক বিষয়বস্তুর ওপর জ্ঞান অর্জন করতে হয়। ফলে বেশিরভাগ সময় শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ অনুভব করে।

(২) বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর চেয়ে শিক্ষকের গুরুত্ব ও প্রাধান্য অনেক বেশি। শুধু তাই নয় এখানে বিষয় নির্বাচন ও উপকরণ নির্মাণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর চেয়ে পাঠক্রমের নীতি নির্ধারক বা উপকরণ নির্মাতাদের পছন্দ ও অপছন্দের গুরুত্ব বেশি। ফলে অনেকসময় এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর মনের মতন হতে পারে না।

(৩) এই পাঠক্রমে ছাত্রদের বিষয়বস্তু জানা ও মনে রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়। ফলে এর মূল্যায়ন ছাত্রের স্মৃতিশক্তি ও বৌদ্ধিক বিকাশের ওপর নির্ভরশীল। ফলে এই ধরনের মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর সামাজিক ও মানসিক অবস্থার মূল্যায়ন সম্ভব হয় না।

(৪) বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রমে পৃথক পৃথক বিষয়বস্তুর জ্ঞানের ওপর অনেক জোর দেওয়া হয়। কিন্তু পাঠ্যবিষয়ের জ্ঞানের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে তা জানানোর সুযোগ

কম। ফলে জ্ঞানগুলোর মধ্যে মৌলিক চিন্তার যে সমন্বয় রয়েছে সেটা না জানায় তাদের মানসিক ক্লান্তি আসে ও অহেতুক মানসিক ক্ষমতার অপচয় হয়।

(৫) বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রমে সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু ও পূর্বনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার বিন্যাস থাকায় ছাত্রদের প্রয়োজন বা শিক্ষকের ক্লাস চলাকালীন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কার্যক্রমের পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের সুযোগ কম। শুধু তাই নয় পূর্ব নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু অনেক সময় ছাত্রের ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুযায়ী ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটাতে পারে না। ফলে অনেক সময় মানবসম্পদ উন্নয়নে ও সামাজিক উন্নয়নে কার্যকরী হতে পারে না।

(৬) এই পাঠক্রম একটি প্রাচীন, ভ্রান্ত ও অধুনাবর্জিত মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও শৃঙ্খলাতত্ত্ব (Theory of formal discipline)-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত।

(৭) এই ধরনের পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর নিজস্ব জন্মগত ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ কম। সকল শিক্ষার্থীকে পূর্বনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে একই পথ অনুকরণ করে জ্ঞান অর্জন ও অভিজ্ঞতা অর্জনে জোর দেওয়া হয়।

(৮) গতানুগতিক পাঠক্রম অর্জিত তাত্ত্বিকজ্ঞানের সঙ্গো কারিগরি ও বৃত্তিমূলক জ্ঞানের সংগতি বিধানে বহুলাংশে অক্ষম। ফলে এই পাঠক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের ফলাফল পরবর্তী কর্মজীবন ও বাস্তব জীবনের সফলতার নির্দেশিকা হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।

(৯) গতানুগতিক পাঠ তাত্ত্বিকজ্ঞান ও তার প্রকাশ করার দক্ষতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়। সেই তুলনায় শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির বিকাশ ও উন্নয়নের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। এইসব বৃত্তিই শিক্ষার আর্দশ লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হবার জন্য অত্যন্ত জরুরি বলে পরিগণিত হয়ে থাকে।

(১০) এই পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর মনকে বিশেষ আমল না দিয়ে তাকে জ্ঞান আহরণে বাধ্য করা হয়। আজকাল দেখা যাচ্ছে এই কারণেই অনেক ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার চেয়ে প্রোফেসন কোর্সে ভর্তির দিকে মেধাবী ছাত্রদের বিশেষ ঝোঁক। অনেক সময় শিক্ষার্থীরা ভাবে যে গতানুগতিক পাঠক্রমে ভারাক্রান্ত শিক্ষা তাদের দীর্ঘ অধ্যবসায় ও সময়ের অপচয় ঘটায়।

৬.৮.২ কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম (Activity Centred Curriculum)

বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রমের বিরুদ্ধে নানা সমালোচনার ফলে শিক্ষাবিদদের নজর কাড়ে কর্মকেন্দ্রিক বা কর্মভিত্তিক পাঠক্রম। কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম শিক্ষা সক্রিয়তা নীতির ভিত্তিতে প্রস্তুত। শিক্ষাবিদরা মনে করেন শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে জীবন ও জীবিকাতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে পাঠক্রমের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ও অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করা। এই ধরনের পাঠক্রমকে জ্ঞানমূলক বিষয়ে ভারাক্রান্ত না করে বিভিন্ন শিক্ষাবিদরা ধারাবাহিক উদ্দেশ্যমুখী বাস্তব কর্মশিক্ষার ওপর বিশেষ নজর দিয়ে থাকেন। পাঠক্রমে কর্মকে শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

রুশো (Rousseau), মন্তেসরি (Montesori), ডিউই (Dewey), গান্ধীজি (Gandhiji) প্রমুখ চিন্তাশীল মনীষীগণ কর্মকেন্দ্রিক পাঠরচনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাদের মতে এই কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম শিক্ষার্থী ও সমাজের কাছে অনেক বেশি কাঙ্খিত পাঠক্রম। জন ডিউই-এর মতে কর্মের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিজীবনে গতি সঞ্চার হয়। আর শিক্ষার্থীর গতিশীল জীবনই তাকে শিক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ জোগায়। গান্ধীজির বুনিয়াদি শিক্ষার প্রকল্পে কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের ব্যবস্থা রয়েছে। গান্ধীজি এই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, "আমার শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর হাত গতানুগতিকভাবে লেখা শুরু করার আগে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করবে ; শিক্ষার্থীর চোখ পরিস্থিতি ও পরিবেশের বিভিন্ন জিনিস জানার সঙ্গো সঙ্গো ছবি, অক্ষর ও শব্দ নিয়ে নাড়াচাড়া করবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠক্রম হবে শিক্ষার্থীর প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গো এক সুরে বাঁধা। শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে পৃথক নয়। এই পরিবেশই তাকে সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ নাম ও শব্দের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দেবে। তাই ছাত্রের চাহিদা ও সামাজিক চাহিদার সমন্বয়ে পাঠক্রম প্রস্তুত হওয়া দরকার। জন ডিউই-এর মতে কর্মভিত্তিক পাঠক্রম শিশুর আবেগ, অনুভব ও চাহিদার ভিত্তিতে হওয়ায় এই ধরনের পাঠক্রম শিশুদের বিকাশে সবচেয়ে উপযোগী পাঠক্রম।

শিক্ষার্থীর মানসিক ও দৈহিক বিকাশের সঙ্গো সামঞ্জস্য রেখে জ্ঞানমূলক, সমাজশিক্ষামূলক ও আনন্দদায়ক সবরকম কাজকর্মকেই এই পাঠক্রমে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই ধরনের পাঠক্রম

প্রস্তুতির সময় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও চাহিদা-এর সঙ্গো সামাজিক চাহিদার কার্যকরী সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করা হয়। এই সমন্বয় ঘটানোর জন্য পাঠক্রমের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন ঃ

(১) পাঠক্রমে কর্মগুলি এমন হবে যা শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশে সহায়তা করবে।

(২) নির্ধারিত কর্ম ও অভিজ্ঞতা যেন শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের স্তর বা পর্যায়ের সঙ্গো সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারে।

(৩) বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গো সঙ্গো নির্ধারিত বিষয়বস্তুর মাধ্যমে গতানুগতিক বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞান আহরণ করা।

(৪) কর্মগুলি যেন শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত ও শিক্ষামূলক হয়।

(৫) অল্প সাহায্য নিয়ে ছাত্ররা নিজেরাই যেন কর্মগুলি করতে পারে।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর ভিত্তিতে যে ধরনের বিষয়বস্তু পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা নীচে দেখানো হল—

কর্মের শ্রেণি বিভাজন	আধুনিক ধারণা
১। দৈহিক বিকাশের কার্যাবলি।	১। স্বাস্থ্যরক্ষার কাজ, খেলাধুলা, ব্যায়াম ইত্যাদি।
২। প্রকৃতি ও সমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের কাজ।	২। পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, ভ্রমণ, সমীক্ষা করা ইত্যাদি।
৩। গঠনমূলক ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির কাজ।	৩। হাতেকলমে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা, পরীক্ষানিরীক্ষা করা, কারুশিল্প, হস্তশিল্প ইত্যাদি।
৪। সৃজনমূলক ও কল্পনাশক্তি বৃদ্ধির কাজ।	৪। রচনা লেখা, ছবি আঁকা, কবিতা ও সাহিত্যচর্চা ইত্যাদি।
৫। সামাজিক বিকাশ ও যোগাযোগ বৃদ্ধির কাজ।	৫। দলবদ্ধ কাজ, চিঠি লেখা, সমাজসেবামূলক কাজ ইত্যাদি।

কর্মভিত্তিক পাঠক্রমের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা ঃ

কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম যদিও বিশেষভাবে সমাদৃত তবুও এ পাঠক্রম ত্রুটিমুক্ত নয়। এ শিক্ষায় নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি দেখা যায়—

(১) এই পাঠক্রমে কর্মসম্পাদনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় বলে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ অনেক সময় ব্যাহত হয়।

(২) অনেক সময় বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানকে কর্মে রূপান্তর করা যায় না। তাই কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম সকল ধরনের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না।

(৩) কোন বিষয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। তাই স্বল্পমেয়াদি শিক্ষা কার্যক্রমে এই পাঠক্রমের ব্যবস্থাপনা করা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। তা ছাড়া কর্মের ভিত্তিতে জ্ঞান অর্জন করতে হয় বলে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি খুব ধীরগতিতে চলে।

(৪) কর্মভিত্তিক পাঠক্রমে শিক্ষার্থীকে একজন শিক্ষকের সহযোগিতায় কর্মসম্পাদন করতে হয়। প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থায় যেখানে একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে অনেক বেশি সংখ্যক ছাত্রকে কর্মসম্পাদন করার জন্য নির্ধারিত করা হয় তারা অনেকেই বেশিরভাগ সময় শিক্ষকের প্রত্যক্ষ নির্দেশদান ও সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে সবসময় এই পাঠক্রম প্রয়োগ করার অসুবিধে রয়েছে।

(৫) কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের সাহায্য উচ্চশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিমূর্ত চিন্তন ক্ষমতার বিকাশ ও গবেষণামুখী কার্যক্রমে সংগঠিত করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ এই পাঠক্রম নীচু ক্লাসে কার্যকরী হলেও উচ্চশিক্ষায় প্রযোজ্য নয়।

(৬) মানুষের অতীত অভিজ্ঞতা ও সাস্কৃতিক ঐতহ্যকে বাদ দিয়ে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না। কিন্তু কর্মভিত্তিক পাঠক্রমে সাধারণত এই দুই গুরুত্ব উপাদানকে বাদ দিয়েই শিশুর বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা ভেবে কর্মসম্পাদন করার ওপর জোর দেওয়া হয়। ফলে কর্মভিত্তিক পাঠক্রম শিক্ষার্থীকে সংস্কৃতিবান করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা দর্শায়।

৬.৮.৩ অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রম (Experience Curriculum)

যে পাঠক্রম বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করে থাকে তাকেই অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রম বলা হয়। এই ধরনের পাঠক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়মূলক তথ্য আহরণ বা কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করা। শিক্ষার মূল লক্ষ্যের সঙ্গে

সংগতি রেখে এখানে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, সামাজিক উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির এবং অভিজ্ঞতা অর্জনে জোর দেওয়া হয়। ফলে পাঠক্রমে এমনভাবে উপাদান নির্বাচন করা হয় যাতে করে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভে সহায়তা ঘটে। এইসব অভিজ্ঞতাগুলিই শিক্ষার্থীকে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বাস্তবজীবন ও ভবিষ্যৎ জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে।

শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির জ্ঞান, আবেগ ও সঞ্চালনমূলক আচরণের সার্বিক বিকাশ ঘটানো। তাই অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সঞ্চালনমূলক প্রতিক্রিয়া ও আচরণে গুরুত্ব দেওয়া। ফলে উপাদান নির্বাচন করার সময় লক্ষ্য রাখা হয় যে উপরোক্ত তিনশ্রেণির আচরণের কোনো একটি বা সব কটির বাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়া শিক্ষার্থীর মধ্যে পাঠক্রমের সাহায্যে সুপরিকল্পিতভাবে সংগঠিত করা যায়। শিক্ষার্থীর বয়স, ক্ষমতা ও চাহিদার এইসব নানা অভিজ্ঞতার বিন্যাস পাঠক্রমে করার চেষ্টা হয়। তাই এখানে জ্ঞান অর্জনের জন্য ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আবার প্রাক্ষোভিক অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে দর্শন, নৈতিকজ্ঞান ইত্যাদি উপাদানের বিন্যাস ঘটানো হয়। কর্মসম্পাদনের অভিজ্ঞতার জন্য পাঠক্রমে সাজানো হয় নানারকম প্রযুক্তির ব্যবহার, পর্যবেক্ষণ, সমীক্ষা, চারুকলা বিষয়ক নানান বিষয়বস্তু। এই সমস্ত ধারণাগত ভিত্তিকে সামনে রেখে অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রমের কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এগুলি হল—

(১) পাঠক্রমে নির্বাচিত উপাদান শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার সঞ্চার করে ও কার্যকরী সমন্বয় ঘটায়।

(২) নির্বাচিত অভিজ্ঞতাগুলি একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে না। এইসব অভিজ্ঞতাগুলি শিশুর বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক, কর্মসম্পাদন ও সঞ্চালনমূলক দক্ষতা বিকাশের উদ্দেশ্যে সম্পর্কযুক্ত।

(৩) শিক্ষার্থীর বয়স, চাহিদা, ক্ষমতা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন অভিজ্ঞতাগুলিকে সুপরিকল্পিতভাবে বিন্যাস করা।

(৪) এই ধরনের পাঠক্রমে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (শিক্ষমূলক ভ্রমণ, সৃষ্টিমূলক কর্মসম্পাদন ইত্যাদি) ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা (পাঠ্যপুস্তক, বেতার, দূরদর্শন ইত্যাদি)-র মাধ্যমে অভিজ্ঞতার কার্যকরী সমন্বয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এই ধরনের পাঠক্রমে কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে, প্রক্রিয়াগত দিক থেকে অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও কর্মভিত্তিক পাঠক্রমের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। এই

পাঠক্রমে বাস্তব পরিস্থিতিতেও হাতেকলমে কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনে জোর দেওয়া হয়। তবে দুই পাঠক্রম দুটি ভিন্ন লক্ষ্যের ওপর গুরুত্ব দেয়। কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমে কর্মসম্পাদনের ওপর জোর দেওয়া হয়। এখানে কর্মসম্পাদনের নিপুণতা ও দৈহিক অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রমে কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অর্থাৎ কর্মের ফলাফলের মাধ্যমে শিক্ষার্থী কতটা জ্ঞান অর্জন করল বা তার প্রাক্ষোভিক আচরণ ও প্রায়োগিক দক্ষতা কতটা পরিবর্তিত হল সেটাই মূল্যায়ন করা হয়।

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় গতানুগতিক পাঠক্রম, কর্মভিত্তিক পাঠক্রম ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রমকে শিক্ষার্থীর তিনটি পর্যায় হিসেবে ধরা যেতে পারে। পরবর্তী অংশে তা আলোকপাত করা হল—

পাঠক্রমের নমুনা	লক্ষ্য
গতানুগতিক	জ্ঞান অর্জনে গুরুত্ব দেওয়া।
কর্মকেন্দ্রিক	কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা।
অভিজ্ঞতাভিত্তিক	বিষয়মূলক তথ্য আহরণ বা কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

তাই গতানুগতিক ও কর্মভিত্তিক পাঠক্রমের লক্ষ্যের ভিত্তিতেই অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রমের লক্ষ্য ও উপাদান নির্মাণ করা যেতে পারে। আর এই দুই পাঠক্রমই অভিজ্ঞতাভিত্তিক, পাঠক্রম দুটি প্রারম্ভিক পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

পাঠক্রম
- প্রথম পর্যায় → বিষয়বস্তুর মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ
- দ্বিতীয় পর্যায় → কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন
- তৃতীয় পর্যায় → অভিজ্ঞতা অর্জন

● অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রমের উপযোগিতা (Utility of Experience Curriculum)

(১) এই পাঠক্রমের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক বা কর্মকেন্দ্রিক উভয় পাঠক্রমকে সাহায্য করা সম্ভব।

(২) এই পাঠক্রমে শিক্ষার মূল তত্ত্ব ও মনোবৈজ্ঞানিক নীতি উভয়ের মধ্যে সংগতি বিধান করে উপাদান চয়ন ও বিন্যাস করা হয়। তাই বাস্তবজীবনে এর গুরুত্ব অনেক বেশি।

(৩) অভিজ্ঞতাধর্মী পাঠক্রম শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক

বিকাশে সমগুরুত্ব আরোপ করে ফলে এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে অনুঘটক হিসেবে বিশেষ কার্যকরী।

(৪) এই পাঠক্রমে পঠনপাঠন, চোখে দেখা, কানে শোনা, হাতের কাজ ইত্যাদির সুযোগ থাকে বলে একইসঙ্গো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ রয়েছে।

● **অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রমের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Experience Curriculum)**

(১) অনেকক্ষেত্রেই পাঠক্রমের প্রত্যাশিত লক্ষ্যের থেকে বাস্তবে অর্জিত লক্ষ্যের মধ্যে ব্যবধান দেখা যায়। যেমন শিক্ষা কর্মসূচির ফলাফল সম্বন্ধে আগাম নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বাড়িতে প্রতিদিন টিভি দেখার পর একটি শিশুর মনে কী অভিজ্ঞতা অর্জন বা প্রতিক্রিয়া হল তা যেমন জানা যায় না, তেমনি পাঠক্রমের তথ্যের বা কর্মসম্পাদনের ফলাফল সম্বন্ধে আগে থেকে কিছু বোঝা যায় না।

(২) এই পাঠক্রমে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম এত বেশি সময় নেয় যে সীমিত সময়সীমার শিক্ষণ কার্যক্রমে এই ধরনের পাঠক্রম সংগঠিত করা সম্ভব হয় না।

(৩) এই পাঠক্রমের মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা যায়। প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় যেখানে অনেক শিশুকে কাগজেকলমে পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয় সেখানে অভিজ্ঞতাধর্মী পাঠক্রমের বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার ফলাফল যাচাই করা সম্ভব হয় না।

৬.৮.৪ অবিচ্ছিন্ন এবং সমাকলিত পাঠক্রম (Undifferentiated and Integrated Curriculum)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় গতানুগতিক, কর্মকেন্দ্রিক ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রম কোনোটাই এককভাবে শিক্ষার প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। শিক্ষার মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যেমন জ্ঞান ও তথ্য আহরণ করার দরকার, তেমনি সেই জ্ঞান কর্ম ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংগঠিত হলে শিক্ষার্থী সহজেই শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। তাই আধুনিক বহু শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাকমিশন এই তিন ধরনের পাঠক্রমের কার্যকরী সমন্বয় ঘটানোর ওপর জোর দিয়েছেন। এই ধরনের সমন্বয়ী পাঠক্রমকে অনেকে সমাকলিত বা Integrated পাঠক্রম বলেন। পাঠক্রমের লক্ষ্য হল বিষয়বস্তুর ভার থেকে পাঠক্রমকে মুক্ত করা এবং শিক্ষার্থীর চাহিদা, ক্ষমতা ও শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জ্ঞান, তথ্য, কর্ম ও অভিজ্ঞতাকে সুপরিকল্পিতভাবে উপস্থাপনা করা। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও আদর্শ জীবনযাপনের লক্ষ্যে এখানে অবিচ্ছিন্ন ও সহায়ক জ্ঞান, কর্ম ও অভিজ্ঞতা উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

এই সমন্বয়ী পাঠক্রমের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়বস্তু যেন বিচ্ছিন্নভাবে না থাকে। গতানুগতিক

পাঠক্রমের বিচ্ছিন্নতা দূর করাও এই পাঠক্রমের বিশেষ লক্ষ্য। এখানে বিষয়বস্তু পৃথক পৃথকভাবে উপস্থাপন না করে বিষয়ের বাস্তব ও মৌলিক ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই চিন্তাধারার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাগুলিকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়—মানবসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও সমাজসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা। এই তিন অভিজ্ঞতার কথা ভেবে অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রমে সাহিত্য, কলা, দর্শন ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মানবীয় বিজ্ঞানে, যেমন রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তেমনি, আবার সামাজিক প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে ভূগোল, ইতিহাস, অর্থনীতি, পৌরবিদ্যাকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে সমাজবিজ্ঞানে। এই সমন্বয়ী নীতির ওপর ভিত্তি করেই অবিচ্ছিন্ন বা কেন্দ্রায়িত পাঠক্রম (core curriculum) প্রস্তুত করা হয়। অনেক শিক্ষাবিদ এই পাঠক্রমের সংজ্ঞা দেওয়ার সময় বলেছেন—যে পাঠক্রমে কোনো বিশেষধর্মী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না তাকেই অবিচ্ছিন্ন বা কেন্দ্রায়িত পাঠক্রম বলা হয়। এই পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য হল—

(১) অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রমে নির্বাচিত বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান দেওয়া হয়। তবে কোনো বিশেষধর্মী (specialization) জ্ঞান দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে না।

(২) অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রমের বিষয়বস্তু সহগামিতা নীতির (principles of correlation) ভিত্তিতে উপস্থাপনা করা হয়। তাই পাঠক্রমে সহগামিতা বা মৌলিক সম্পর্কযুক্ত উপাদান হিসেবে তিনটি বিষয় যেমন উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, শারীরবিদ্যার সমন্বয়ে স্কুলের পাঠক্রমে জন্ম হয়েছে জীবন বিজ্ঞানের (Life Science)।

(৩) এই পাঠক্রমে ছাত্রদের সাধারণ বুদ্ধি (g-factor) ও চাহিদা অনুযায়ী বিষয়বস্তু ও অভিজ্ঞতা নির্বাচন করা হয়। ফলে সকল ছাত্রকেই একই পাঠক্রম বিষয় অনুশীলন করতে হয়। এই ধরনের চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত হয় মাধ্যমিক স্তরের কেন্দ্রায়িত বিষয় (core subject)।

(৪) সহগামিতার নীতিতে যে কেন্দ্রায়িত পাঠক্রম প্রস্তুত হয় সেখানে বিশেষধর্মী (specialization) -এর গুরুত্ব থাকে না। ফলে এই পাঠক্রম উচ্চশিক্ষার 'বিশেষধর্মী' যে পাঠক্রম থাকে তার প্রারম্ভিক পর্বের সোপান হিসেবেই শুধুমাত্র প্রাধান্য পায়। এই পাঠক্রম উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না।

(৫) অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের উপযোগিতার কথা চিন্তা করে বিষয়বস্তু মূলত মানবাত্মক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ও সামাজিক অভিজ্ঞতা ইত্যাদি অনুযায়ী উপস্থাপনা করা হয়।

● অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রমের উপযোগিতা (Utility of Undifferentiated Curriculum)

(১) এই পাঠক্রম বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে কার্যকরী সমন্বয়সাধন করে ফলে শিক্ষার্থী স্বল্পসময়ে একই সঙ্গো অনেক ধরনের জ্ঞান অর্জন করতে সমর্থ হয়।

(২) এখানে বিষয়বস্তু মৌলিক ধারণাগত ভিত্তিতে পরস্পরের সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত ফলে শিক্ষার্থীর অনুশীলন এবং অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি অনেক বেশি।

● অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রমের সীমাবন্ধতা (Limitations of Undifferentiated Curriculum)

(১) সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গো সঙ্গো বিবর্তন ঘটেছে বিভিন্ন বিষয়ের মৌলিক ধারণা, পরিধি, মূল উপাদান ইত্যাদির। তাই বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে মিল খুঁজে তাকে ভিত্তি করে পাঠক্রম প্রস্তুত করা সবসময় সম্ভব হয় না আর হলেও অনেক সময় সেই সমন্বয় শিক্ষার্থীর নিকট বোধগম্য হয় না।

(২) অনেক সময় অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রমে কৃত্রিম সমন্বয়নের চেষ্টার ফলে শিক্ষার্থীর মনে ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়।

(৩) কেন্দ্রীয় পাঠক্রমের মাধ্যমে পাঠক্রমে যে সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয় তা অনেক সময় শিক্ষার্থী মানসিকভাবে গ্রহণ নাও করতে পারে।

৬.৮.৫ জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম (Life Centred Curriculum)

শিক্ষার্থী বা শিশুর জীবনের সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত যে পাঠক্রম তাকেই বলা হয় জীবনভিত্তিক বা জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা। শিক্ষাবিদরা দেখেছেন পাঠক্রম শুধু গতানুগতিক, কর্মকেন্দ্রিক, অভিজ্ঞতাভিত্তিক, সমাকলিত বা অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রম না করে শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত হওয়াই একান্ত প্রয়োজন। এই ধরনের শিক্ষা যে একদিকে শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্ত্বিক ধারণাকে চরিতার্থ করতে সাহায্য করে তেমনি এ শিক্ষা দার্শনিক তত্ত্বের বাস্তব রূপায়ণেও সহায়ক। অর্থাৎ জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম শিক্ষার দার্শনিক, মনোবৈজ্ঞানিক, সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্নপ্রকার লক্ষ্যের কার্যকরী সমন্বয়সাধন করার চেষ্টা করে।

শিক্ষার তাৎক্ষণিক লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটানো। আর শিক্ষার সুদূর প্রসারী বা চরম লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির কল্যাণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে ব্যক্তিকল্যাণ ও সমাজকল্যাণ উভয় ধরনের কল্যাণের কামনা বর্তমান। আবার ব্যক্তির উন্নয়ন নির্ভর করে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতা, দক্ষতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদির ওপর। অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষা ব্যক্তির জীবনের সঙ্গো জড়িত। তাই শিক্ষার যথার্থতা নির্ভর করবে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু যদি জীবনের সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত হয়। তাই জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রমের লক্ষ্য ব্যক্তির জীবনের উন্নয়নের সঙ্গো বর্তমান পরিবেশ ও ভবিষ্যৎ জীবনের নানান অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করা ও সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলা অর্থাৎ শিক্ষার্থীর জীবনের উদ্দেশ্যে ও জীবনের সঙ্গো সম্পৃক্ত যে শিক্ষা-পাঠক্রম তাকেই জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম বলা হয়। জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

(১) জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর চাহিদা পরিতৃপ্ত করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ফলে পাঠক্রমের উপাদানগুলো শিক্ষার্থীর চাহিদাভিত্তিক বেছে নেওয়া হয়।

(২) জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রমে অভিজ্ঞতাগুলি এমনভাবে থাকবে যা শিক্ষার্থীর জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত আর যা শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করবে। এ ধরনের পাঠক্রম তখন পড়ুয়ার কাছে বিশেষ অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

(৩) জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম একদিকে যেমন ব্যক্তি জীবনের চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করবে, তেমনি এর উপাদান আবার সামাজিক চাহিদাকেও পরিতৃপ্ত করবে। এই ধরনের উপাদান ব্যক্তির জীবনের সঙ্গো সামাজিক জীবনের মেলবন্ধন ঘটিয়ে শিক্ষার্থীকে তার সামাজিক অভিযোজনে সাহায্য করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে শিক্ষার্থীর জীবনের উন্নয়ন ও জীবনযাপনের প্রক্রিয়াকে সহায়তা করার লক্ষ্যে পাঠক্রমের উপাদানগুলোর নির্বাচন ও সুপরিকল্পিতভাবে বিন্যাস করার ওপর শিক্ষাবিদরা বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে পাঠক্রমে যেসব উপাদান যুক্ত করার ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয় সেগুলিকে তিনশ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে—

(১) শিক্ষার্থীর বয়স ও পরিণতমনের সঙ্গো সামঞ্জস্য রেখে মানসিক ও দৈহিক বিকাশের উপযোগী উপাদান।

(২) মৌলিক চাহিদা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও প্রবণতার কথা চিন্তা করে জীবনযাপন ও জীবনবিকাশের উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞতার সংযোজন।

(৩) শিক্ষার্থীর সামাজিক বিকাশ ও অভিযোজনের সাহায্যে সমাজের গুণগতমান উন্নয়নের উপাদান।

৬.৯ শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠক্রমের ভূমিকা (Role of Curriculum in Education)

পাঠক্রম শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পাঠক্রমের কাজ হল শিক্ষার নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করা। পাঠক্রমই ঠিক করে দেয় কী পড়ানো হবে আর কীভাবে পড়ানো হবে। কী উপকরণ লাগবে বা কীভাবে মূল্যায়ন হবে। অর্থাৎ শিক্ষার গতিপ্রকৃতি ও কার্যসূচি সবই নির্ভর করে থাকে পাঠক্রমের ওপর। অর্থাৎ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয়দিক থেকে শিক্ষা কার্যক্রমে পাঠক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। পাঠক্রমই শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও কার্যকারিতাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে প্রভাবিত করে।

পাঠক্রমের সাহায্যে শিক্ষার দার্শনিক, সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তির কার্যকরী সমন্বয়সাধন করার চেষ্টা হয়। ফলে পাঠক্রম রচনার উদ্দেশ্য ও শিক্ষার মূল লক্ষ্য কার্যত অভিন্ন। শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর জীবনে উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজের ও জাতির উন্নয়ন ঘটানো। এই উন্নয়নের গতিশীলতা ও গুণগতমান নির্ভর করে শিক্ষাকর্মসূচির পাঠক্রমের ওপর। তাই পাঠক্রম শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনার মূল হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

শিক্ষার্থীর বাস্তবজীবন ও জীবিকার সঙ্গে তার পাঠক্রম যদি সংযুক্ত হতে না পারে তাহলে সেই পাঠক্রম তেমনভাবে সর্বজনীন আবেদন রাখতে পারে না। তাই আধুনিক পাঠক্রমের লক্ষ্য যেমন বিষয়বস্তুর তাত্ত্বিকজ্ঞান পরিবেশনের সঙ্গে সমাজ ও শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী কর্মদক্ষতা, অভ্যাস ও আদর্শ চরিত্র গঠনে সহায়তা করা তেমনি স্বশিক্ষণ (self-learning) জীবিকা অর্জন ও গবেষণার কাজে সাহায্য করা। অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পাঠক্রমের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

আধুনিক ধারণা অনুযায়ী পাঠক্রমের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল সম্বন্ধে নির্দেশ দান করা। তা ছাড়া মূল্যায়নের পদ্ধতি কী হবে তা পাঠক্রমে সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া

থাকে। শুধু তাই নয় ছাত্রদের নিজেদের প্রগতি জানার জন্য স্বমূল্যায়নের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা পাঠক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। অর্থাৎ শিক্ষার মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচন, শিক্ষণপদ্ধতি, উপকরণ প্রস্তুতি ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এইসব নানা স্তরে পাঠক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

৬.১০ উপসংহার (Conclusion)

ওপরের আলোচনা থেকে জানা যায় শিক্ষা কার্যক্রমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পাঠক্রম। উপযুক্ত পঠনপাঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পাঠক্রমে সুপরিকল্পিতভাবে বিষয়বস্তু, উপকরণ, শিক্ষণ পদ্ধতি, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদির কার্যকরী সমন্বয় ঘটানো হয়। এই পাঠক্রমের দুটি প্রধান ধাপ হচ্ছে পাঠ ও পাঠ্যসূচি। পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রেক্ষাপটে ও আধুনিক জীবনধারার বিচিত্র প্রয়োজনে শিক্ষার লক্ষ্যের নানা বিবর্তন ঘটেছে। সেই অনুযায়ী পাঠক্রম রচনা ও প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে নানা প্রকারের পাঠক্রম—গতানুগতিক, কর্মকেন্দ্রিক, অভিজ্ঞতাভিত্তিক, সমাকলিত ও জীবনভিত্তিক পাঠক্রম ইত্যাদি প্রস্তুত হয়েছে। এইসব পাঠক্রমের তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের যেমন কিছু স্বাতন্ত্র্য রয়েছে তেমনি নানা প্রকারের পাঠক্রমে কিছুটা সাধারণ গুণাবলি রয়েছে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উপযোগিতা অনুযায়ী এইসব পাঠক্রমের শিক্ষা কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম।

৬.১১ প্রশ্নাবলি (Questions)

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay type Questions)

১। পাঠক্রমের সংজ্ঞা দিন। পাঠক্রম বলতে কী বোঝায় তা বিবৃত করুন।

২। ব্যাপক অর্থে পাঠক্রম বলতে কী বোঝায়? পাঠ, পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

৩। পাঠক্রমের প্রধান প্রকারভেদগুলি নিয়ে আলোচনা করুন।

৪। বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রম নিয়ে আলোচনা করুন। এই পাঠক্রমের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি উল্লেখ করুন।

৫। কর্মকেন্দ্রিক ও বিষয়ভিত্তিক পাঠক্রমের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৬। অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রম কী? এই পাঠক্রমের উপযোগিতা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Questions)

১। জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম কি?

২। শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠক্রমের ভূমিকা লিখুন।

৩। অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রমের উপযোগিতা কি?

৪। পাঠক্রমের আধুনিক ও প্রাচীন ধারণা লিখুন।

একক ৭ ❑ পাঠক্রমের ভিত্তি ঃ দার্শনিক, মনোবৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্ত্বিক (Basis of Curriculum : Philosophical, Psychological and Sociological)

গঠন

৭.১ সূচনা
৭.২ উদ্দেশ্য
৭.৩ পাঠক্রমের দার্শনিক ভিত্তি
  ৭.৩.১ ভাববাদী দর্শন ও পাঠক্রম
  ৭.৩.২ প্রকৃতিবাদ ও পাঠক্রম
  ৭.৩.৩ প্রয়োগবাদ ও পাঠক্রম
৭.৪ পাঠক্রমের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি
৭.৫ পাঠক্রমের সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি
৭.৬ উপসংহার
৭.৭ প্রশ্নাবলি

৭.১ সূচনা (Introduction)

সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। তবে এই প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন মানুষের চাহিদা ও সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নানাভাবে পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার লক্ষ্যকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই শিক্ষার ব্যক্তিকেন্দ্রিক লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর মানসিক, শারীরিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশসাধন করা এবং এই বিকাশের মাধ্যমে সমাজের উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করা। তাই শিক্ষা বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু এবং অনুশীলন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষা যেমন মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর আত্মনির্ভরতা ও আত্মতৃপ্তি বৃদ্ধি করার সঙ্গো সঙ্গো তার জীবনের গুণগতমান বৃদ্ধি করা এবং সমাজ ও ব্যবহারিক জীবনে সহায়তা করা। ফলে শিক্ষা

সামাজিক, মানসিক ও মূল্যবোধ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব যেমন দিয়ে থাকে, আবার শিক্ষা পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের সুষম বিকাশের সাহায্যে আত্মোপলব্ধি ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নয়নের ওপরও গুরুত্ব দেয়। অর্থাৎ এইসব লক্ষ্যকে সামনে রেখে পাঠক্রমে দার্শনিক, সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক ধারণাগত ভিত্তিগুলির কার্যকরী সমন্বয় ঘটানোর ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়।

৭.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীদের—

- পাঠক্রমের ভিত্তি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা জন্মাবে।

৭.৩ পাঠক্রমের দার্শনিক ভিত্তি (Philosophical Basis of Curriculum)

পাঠক্রমের প্রাচীন ও আধুনিক মতবাদগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় পাঠক্রম কখনও শিক্ষার্থীর আত্মতৃপ্তি ও আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি করার ওপর জোর দিয়েছে, আবার কখনও পাঠক্রম ব্যবহৃত হয়েছে সংস্কারমুক্ত জীবন প্রস্তুত করতে। ফলে দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রেক্ষাপট, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহারের ধারা নানাভাবে প্রভাবিত করেছে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে। ব্যক্তির কার্যকরী অভিযোজনের সাহায্য করার লক্ষ্য নানাভাবে প্রভাব ফেলেছে পাঠক্রম গঠন ও পরিকাঠামোর প্রস্তুতিতে। জীবনদর্শন, মূল্যবোধ ও আর্দশের কথা মনে রেখে শিক্ষণপদ্ধতি, পাঠক্রম ও মূল্যায়ন পদ্ধতি নানাভাবে প্রস্তুত হয় যা মানুষের মৌলিক চাহিদার পরিতৃপ্তি ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে থাকে। মানসিক পরিতৃপ্তি, মূল্যবোধ বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে নানান দার্শনিক মতবাদের প্রভাব দেখা যায়। পাঠক্রমের ক্ষেত্রে দর্শনশাস্ত্রের প্রভাব মূলত নিম্নোক্ত বিষয়ে পরিলক্ষিত হয় ঃ

(১) **পাঠক্রম নির্ণয়ে দর্শনের প্রভাব ঃ** দর্শনশাস্ত্র যেমন নিয়ন্ত্রিত করে শিক্ষার লক্ষ্য কী হবে, তেমনি পাঠক্রম নির্ণয় করে কীভাবে শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে। দেশকাল ভেদে যেমন সমকালীন দার্শনিক চিন্তাধারা প্রভাবিত হয় তেমনি এই দার্শনিক চিন্তাধারাই আবার প্রভাবিত করবে কী কী বিষয় থাকবে ও কীভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপনা করা হবে। অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্র প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে পাঠক্রমকে।

(২) **পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ ঃ** বিভিন্ন দার্শনিকরা পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে নানা মতবাদ পোষণ করেন যা বিভিন্ন সময়ে দেশের পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নানা নিয়মকানুন আরোপ করে থাকে।

প্রকৃতিবাদীরা যেমন পাঠ্যপুস্তকে নানা ছবি ও উদাহরণের দিকে জোর দিয়েছেন তেমনি ভাববাদীরা গুরুত্ব দিয়েছেন লেখকের প্রকাশভঙ্গির ওপর। প্রয়োগবাদীরা মনে করেন বিষয়বস্তুর প্রায়োগিক দিকের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

(৩) **শিক্ষণ পদ্ধতি ঃ** পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর সঙ্গে গুরুত্ব দেওয়া হয় পদ্ধতির পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে। যেসব পদ্ধতি আমরা দেখি সেগুলি সাধারণ বিভিন্ন দার্শনিক ভিত্তির উপর দাড়িয়ে রয়েছে। ভাববাদীদের মতে শিক্ষণ পদ্ধতি যেমন শিক্ষক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত তেমনি প্রকৃতিবাদীরা জোর দিয়েছেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতির উপর। প্রয়োগবাদীরা জোর দিয়েছেন জীবনকেন্দ্রিক বা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর।

(৪) **মূল্যায়ন ঃ** শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠক্রম, পদ্ধতি-উপাদান ও পরীক্ষার যথার্থ বিচার করা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে পরিমার্জন, সংশোধন ও পরিবর্ধন করা। শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, পদ্ধতি ইত্যাদি যেহেতু দর্শনের প্রভাবে প্রভাবিত তাই শিক্ষার মূল্যায়ন ও তার ফলাফল নির্ধারণ করা দর্শনের প্রভাবে প্রভাবিত।

পাঠক্রমের দার্শনিক ভিত্তি ঃ

শিক্ষার ক্ষেত্রে দার্শনিক মতবাদগুলি তিনটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত। সেগুলির মধ্যে প্রধান-ভাববাদী (idealism) দর্শন, প্রকৃতিবাদী দর্শন (naturalism) এবং প্রয়োগবাদী দর্শন। এই প্রত্যেকটি দার্শনিক মতবাদের ভিত্তিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও পাঠক্রম রচনার নীতি বিভিন্ন সময়ে স্থির হয়েছে। এইসব রীতিনীতিকে পাঠক্রমের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

৭.৩.১ ভাববাদীদর্শন ও পাঠক্রম

দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম হচ্ছে ভাববাদী দর্শন। এই দর্শনে আত্মোপলব্ধির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এই ভাববাদীদের মতে শিক্ষার মূল লক্ষ্য শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক সত্ত্বার (spiritual self) বিকাশে সাহায্য করা।

এই দলের দার্শনিকরা মনে করেন জড়জগৎ ছাড়াও আরও একটা আধ্যাত্মিক জগৎ রয়েছে। আর মানবসত্তার মূল লক্ষ্য হবে সেই জগৎ বা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। শিক্ষার লক্ষ্য সত্যকে জানা সুন্দরকে চেনা ও ভালবাসাকে উপলব্ধি করা। এককথায় ভাববাদীরা আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে জগৎ-এর সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্ (truth, love and beauty) অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমে সত্যকে জানা, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং নান্দনিক উপলব্ধির প্রকাশ ঘটানোই হবে পাঠক্রমের মূল লক্ষ্য।

শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক সত্ত্বার (spiritual) বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে ভাববাদীরা জোর দিয়েছেন শিক্ষার্থীর নৈতিক (moral) বৌদ্ধিক (intellectual) ধার্মিক (religious) ও নান্দনিক (asthetic) বিকাশের ওপর। ভাববাদী দর্শন অনুযায়ী পাঠক্রমে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের বিকাশের ওপর।

পাঠক্রমের উপরোক্ত লক্ষ্যগুলোকে সামনে রেখে এখানে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে। সত্যকে জানা ও এই ব্যাপারে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উদ্দেশ্যে গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে জোর দেওয়া, তেমনি আবার নৈতিক উন্নয়নের জন্য ভাষা, ন্যায়শাস্ত্র, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ের গুরুত্ব রয়েছে। নান্দনিক ক্ষমতা বিকাশের উদ্দেশ্যে সাহিত্য, কবিতাপাঠ, কারুকলা বিকাশে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা, হাতের কাজ ইত্যাদি গুরুত্ব পেয়েছে কর্ম সচেতনতা ও দৈহিক বিকাশের জন্য। ভাববাদীরা মনে করতেন উপযুক্ত স্বাস্থ্য ও দৈহিক বিকাশ ছাড়া পড়ুয়ার মধ্যে আধ্যাত্মিক বিকাশ ও কর্মসচেতনতা সম্ভব নয়। তাই ভাববাদীদের মতামতকে অনুসরণ করে পাঠক্রমে দুই প্রকারের কার্যক্রমের সংযোজন হয়—দৈহিক বিকাশসংক্রান্ত কার্যক্রম ও আধ্যাত্মিক সংক্রান্ত কার্যক্রম। ভাববাদী কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বস্তুকেন্দ্রিকতা নয়, তা হল আত্মকেন্দ্রিক আত্মোপলব্ধি। সার্বজনীন নীতিবোধ ও মূল্যবোধ এই পাঠক্রমের মূলভিত্তি। ভাববাদীদের মতানুযায়ী নৈতিক বিকাশ, বৌদ্ধিক ও ভাবময় জীবনের উন্নতিসাধন করা হবে পাঠক্রমের লক্ষ্য। তেমনিভাবে আর্দশ শিক্ষক হবেন তিনি যার জীবনের পরিপূর্ণ উপলব্ধি রয়েছে। সবদিক থেকে ভাববাদ শিক্ষাকে সংকীর্ণতা মুক্ত করে এক সার্বজনীন আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে এখানে শিক্ষণ পদ্ধতি মূলত শিক্ষককেন্দ্রিক। শিক্ষাক্ষেত্রে ভাববাদের যারা প্রয়োগ করেন তাদের মধ্যে কমিনিয়াস (Cominious),প্লেটো (Plato),কান্ট (Kant),পেস্তালজি (Pestalozzi),ফ্রয়েবেল (Froebel),রবীন্দ্রনাথ (Rabindranath) প্রমুখ। এরা শিক্ষাক্ষেত্রে আত্মোপলব্ধি, আধ্যাত্মিক জীবন, ভাবময় জীবন ও বিশ্বমানবাত্মা বোধের বিকাশ ও উন্নয়নসাধনে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন।

৭.৩.২ প্রকৃতিবাদ ও পাঠক্রম (Naturalism and Curriculum)

ভাববাদী দর্শনের বিকল্প হিসাবে আরেক ধরনের দার্শনিক মতবাদ লক্ষ্য করা যায় যাকে বলা হয় প্রকৃতিবাদ দর্শন। এই মতবাদ অনুযায়ী বিশ্বপ্রকৃতিতে যা কিছু দেখা যায় তাই হল বাস্তব। আর বাকী সব মিথ্যা। এই মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকরা মনে করেন বস্তুজগতের বাইরে আর কিছু নেই। মানুষ হল এই বস্তু জগতের অংশবিশেষ। শিক্ষাক্ষেত্রে এই চিন্তার প্রয়োগ প্রকৃতিবাদী শিক্ষা দর্শন নামে পরিচিত।

রুশো এই মতবাদকে বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং পরবর্তী যুগে তার মতবাদ অনুসরণ করে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ শিক্ষাক্ষেত্রে এর কার্যকরী রূপ দেন। অবশ্য হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer), পেস্তালজি (Pestalozzi), রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদকে নানাভাবে কাজে লাগিয়েছেন। প্রকৃতিবাদ অনুযায়ী পাঠক্রমের লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর আত্মপ্রকাশ ও আত্মসংরক্ষণে সাহায্য করা। এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা নিজের প্রকৃতি ও চাহিদা অনুযায়ী যাতে বিকাশ লাভ করতে পারে সেই দিকেই শিক্ষায় বিশেষ জোর দেওয়া উচিত বলে মনে করেন। এই মতবাদ অনুযায়ী পড়ুয়াদের ওপর কিছু জোর করে চাপিয়ে দিয়ে শেখানো উচিত নয়। বরং শিক্ষার্থীর ক্ষমতা ও চাহিদা অনুযায়ী পাঠক্রম নির্ধারণ করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার বলে এই দলের দার্শনিকরা মনে করেন। আসলে বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিক্ষার্থী যাতে নিজের চাহিদা ও উন্নয়ন ঘটাতে পারে সেদিকে বিশেষ নজর দেবার কথা এই প্রকৃতিবাদী পাঠক্রমে বলা হয়েছে।

প্রকৃতিকে জানা ও প্রকৃতির সঙ্গে ভারসাম্য রেখে আত্মসংরক্ষণের দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে এই পাঠক্রমে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই প্রকৃতিবাদীরা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি তারই পাশাপাশি জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ ও অভিজ্ঞতাকে বিষয় হিসেবে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন। এরই সহায়ক হিসেবে এখানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় যেমন—প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, কৃষিবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদিকে আবশ্যিক পাঠ্যবিষয় হিসেবে বলা হয়েছে। প্রকৃতি ও প্রযুক্তিচর্চার সঙ্গে সঙ্গে গণিত, ভাষা, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি যাতে হয় সেদিকে প্রকৃতিবাদীরা নির্দেশ দান করেছেন।

শিক্ষার্থীরা যাতে পরিবেশ সম্পর্কে সহজে সচেতন ও সক্রিয় হতে পারে তাই পরিবেশ সমীক্ষণ, কৃষিকাজ ইত্যাদি বিষয় পাঠক্রমে সংযুক্ত করার দিকে প্রকৃতিবাদীরা বিশেষ সচেষ্ট হন। প্রকৃতিবাদী দর্শনে উন্নত মানবিক মূল্যবোধ ও গুণাবলির বিকাশে তেমন কোনো নজর দেওয়া হয়নি। প্রকৃতিবাদীরা শিক্ষার্থীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ একেবারে অগ্রাহ্য করেছেন। এই মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকরা পাঠক্রমের অংশ হিসেবে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলোর কথাই বিশেষ করে বলেছেন যেমন—প্রকৃতি পরিচয়, কৃষিবিজ্ঞান ইত্যাদি। প্রকৃতিবাদীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত মনোভাব, প্রেষণা ও চাহিদার গুরুত্ব যতটা দিয়েছেন সেই তুলনায় শিক্ষক, শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠক্রমের গুরুত্ব ঠিক ততটা আরোপ করেননি।

৭.৩.৩ প্রয়োগবাদ ও পাঠক্রম (Pragmatism and Curriculum)

প্রকৃতিবাদী ও ভাববাদী দর্শনের তুলনায় বাস্তবসম্মত হচ্ছে প্রয়োগবাদ দর্শন। প্রয়োগবাদের মূল কথা হল উপযোগিতা। প্রয়োগবাদীরা মনে করেন যে অভিজ্ঞতা বা ধারণা ব্যবহারিক প্রয়োগে ভালো তাই সত্য, তাই গ্রহণযোগ্য। প্রয়োগবাদে পরীক্ষকদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই মতামত অনুযায়ী পাঠক্রম, শিক্ষার্থীর জীবনে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে পারে এমনভাবে বিষয় নির্বাচন করা দরকার। এই মতামত অনুযায়ী পাঠক্রম হওয়া উচিত কর্মভিত্তিক ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক। তা ছাড়া বিষয়গুলিকে আলাদা আলাদাভাবে উপস্থাপন না করে সমন্বয়ের নীতির ভিত্তিতে অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রম রচনায় গুরুত্ব দেওয়ার কথা প্রয়োগবাদীরা বিশেষভাবে নির্দেশ করেছেন।

বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রয়োগবাদীরা বাস্তব জীবনের সহায়ক হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারে যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন তেমনি আত্মরক্ষার কৌশল, যোগাযোগ ও সমাজ সচেতনতা ইত্যাদি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে এই পাঠক্রমে গুরুত্ব পেয়েছে ভাষা শিক্ষা, ভূগোল, ইতিহাস, স্বাস্থ্যবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়বস্তু। এই পাঠক্রমে আবশ্যিক বিষয়ের যেমন উল্লেখ রয়েছে তেমনি ঐচ্ছিক অর্থাৎ ছাত্রদের পছন্দ মাফিক বিষয় নির্বাচনেরও গুরুত্ব রয়েছে।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন ভাবধারা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে পাঠক্রম প্রস্তুত হয়েছে। এই ভাবধারাগুলির মধ্যে যেমন বৈসাদৃশ্য রয়েছে, তেমনি আবার সাদৃশ্যও রয়েছে। শুধু তাই নয় একই বিষয়কে বিভিন্নভাবে দার্শনিকরা ব্যবহার করেছেন। এমনকি পাঠক্রমে বিষয় নির্বাচন ও সুবিন্যস্ত করার নীতিরও তারতম্য রয়েছে। অবশ্য আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই সবকটি মতবাদের সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে রচিত পাঠক্রম আধুনিক শিক্ষায় সবচেয়ে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

এই তিন প্রকারের দার্শনিক চিন্তা ছাড়াও আধুনিককালে মার্কসবাদী দর্শন শিক্ষা ও পাঠক্রমের ক্ষেত্রে এক নতুনদিকের সূচনা করে। এদের প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়াই এই পাঠক্রমের প্রধান লক্ষ্য।

৭.৪ পাঠক্রমের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি (Psychological Basis of Curriculum)

আধুনিক শিক্ষা লক্ষ্য ও কার্যক্রম প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমন্বয়সাধন ঘটিয়েছে। তবে আধুনিক শিক্ষার কার্যকরী রূপ ও বিকাশে যে সকল বিজ্ঞান বিশেষভাবে সহায়তা করেছে, সেগুলির

মধ্যে মনোবিজ্ঞানের অবদানই সবচেয়ে বেশি বলে পরিগণিত। পাঠক্রমের মূলনীতি ও ধারণা নিয়ে ইতিপূর্বে যেসব আলোচনা করা হয়েছে তাতে বারবার শিক্ষার্থীর প্রসঙ্গা উল্লেখ করা হয়েছে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত উপাদান শিশুকে ঘিরে প্রস্তুত হবে এটাই স্বাভাবিক এবং পাঠক্রমও তার ব্যতিক্রম নয়। মনোবিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ তথ্য ও তত্ত্বগুলি বিভিন্নভাবে পাঠক্রমের লক্ষ্য, কাঠামোও নিয়ন্ত্রণ করেছে। নীচে অনুরূপ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হল ঃ

শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ (Growth and Development of Child)

গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুদের শিক্ষার ওপর গুরুত্ব ছিল কম। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিশুর সঠিক বিকাশ ও বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিশুর প্রজ্ঞা বিকাশের (Cognitive Development) গতি প্রকৃতির কথা চিন্তা করে সহজ থেকে কঠিন, সরল থেকে জটিল, মূর্ত থেকে বিমূর্ত, দৈহিক সক্রিয়তা থেকে মানসিক সক্রিয়তার দিকে বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ ঘটানো হয়। এই নীতি অনুযায়ী পাঠক্রমে বিষয়বস্তু ও অভিজ্ঞতার সমাবেশ শুধুমাত্র বিকাশের গতি অনুসরণ করে না। বিকাশের স্বাভাবিক গতি যাতে ব্যাহত না হয় এবং বিকাশের প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে সেদিকে পাঠক্রমে বিশেষ নজর দেওয়া হয়ে থাকে। মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষালব্ধ তত্ত্বের মাধ্যমে পাঠক্রমে প্রজ্ঞামূলক সংগঠন তথা জ্ঞানের একক, যেমন—জানা, বোঝা, প্রয়োগ করা ইত্যাদি ধাপে পাঠক্রমে বিষয় নির্বাচনের নীতি নির্ধারণ হয়; পিঁয়াজে, ব্রুনার এসব মনীষীরা এই ব্যাপারে নানা মতবাদ দিয়েছেন। শুধু তাই নয় শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের কথা চিন্তা করে আধুনিককালে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির বয়স নির্ধারিত হয়ে থাকে।

ব্যক্তিগত বৈষম্য (Individual Differences)

শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে দুইজন শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ এক নয়। সমস্ত শিশুদের চিন্তায় ও আচরণে অনেক সাদৃশ্য যেমন রয়েছে, তেমনি আবার রয়েছে বৈসাদৃশ্য। তারা যত বড়ো হতে থাকে ততই ব্যক্তিগত বৈষম্য প্রকাশিত হয়। পাঠক্রমে দেখা যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে শিক্ষা তার প্রকার ও প্রকরণ বিশ্বের সর্বত্রই প্রায় একপ্রকার। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ব্যক্তিগত বৈষম্যকে গুরুত্ব না দিয়ে অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রম অনুসরণ করা হয়। তবে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ুয়ার স্তরে শিক্ষার্থীর ক্ষমতা ও চাহিদা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিভাজন (বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য ইত্যাদি) প্রস্তুত করা হয়। শিক্ষার্থীর চাহিদা, পছন্দ, অপছন্দ, বুদ্ধিবৃত্তি, বিশেষ প্রবণতা ইত্যাদি ব্যক্তি বৈষম্যের কথা চিন্তা করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠক্রমের বিষয় নির্বাচনের বিশেষ নীতি নির্ধারিত হয়েছে। ব্যক্তিগত বৈষম্যকে

কাজে লাগিয়ে পাঠক্রমের মাধ্যমে ব্যক্তির ও সমাজের উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে আধুনিক সবরকম পাঠক্রমে।

শিখনের সঞ্চালন (Transfer of Learning)

মনোবিজ্ঞানের শিখনের সঞ্চালন নীতির ওপর ভিত্তি করে পাঠক্রমের অভিজ্ঞতাগুলি এমনভাবে নির্বাচন করা হয় যাতে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা পরবর্তী অভিজ্ঞতা লাভে সহায়ক হয়। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার আরও একটি দিক হল কোনো বিষয়বস্তু উপস্থাপনা করার পূর্বে অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দিকগুলো চিহ্নিত করা ও শিক্ষার্থীর আত্মীকরণে (order of assimilation) সাহায্য করা।

এ ছাড়াও, সাধারণীকরণের তত্ত্ব (Theory of generalization) অনুযায়ী পাঠক্রমে বিষয় ও অভিজ্ঞতার সমাবেশ ঘটানো হয় যেন শিক্ষার্থী তার সাধারণীকরণের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে একটি চূড়ান্ত সত্যে উপনীত হতে পারে। এ ছাড়া পাঠক্রমের সহগতিমূলক নীতির মূল ভিত্তি সদৃশ উপাদানের তত্ত্ব (Theory of identical elements)।

শিক্ষার্থীর স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধি, প্রেষণা, চাহিদা, মনোযোগ ইত্যাদি বহুবৈশিষ্ট্য পাঠক্রমের বিষয় নির্বাচন, শিক্ষণ পদ্ধতি, বিষয়ের উপস্থাপনা, রুটিন নির্বাচন ইত্যাদি নানা পর্যায়ে নানাভাবে প্রভাব ফেলেছে।

৭.৫ পাঠক্রমের সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি (Sociological Basis of Curriculum)

আধুনিককালে পাঠক্রম যেমন মনোবিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞান দ্বারাও বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। শিক্ষার সামাজিক উপযোগিতা চরিতার্থ করার পক্ষে পাঠক্রমে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন নীতিকে নানাভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। নীচে এরকম কয়েক নীতি ও উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হল ঃ

শিক্ষার নানাপ্রকার সংজ্ঞার অন্যতম হল সমাজতান্ত্রিক সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী শিশু বা শিক্ষার্থীর মধ্যেকার অন্তর্নিহিত শক্তি বা সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা ও তাকে তার পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে সাহায্য করাই হল শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিশুর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য জন্মসূত্রে প্রাপ্ত হলেও পরবর্তী জীবনের গতি প্রকৃতি তার জীবন ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের বিভিন্ন চাহিদার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়। উপযুক্ত পাঠক্রম তাই শিশুর ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের চাহিদার পরিতৃপ্তির সহায়ক হিসেবে কাজ করে। শুধুমাত্র ব্যক্তিমুখী বিকাশ হলে তাতে ব্যক্তির সুপ্ত

প্রতিভার পূর্ণতা লাভ হবে ঠিক, কিন্তু শিক্ষার্থী পরিবেশ সম্বন্ধে উদাসীন হলে তা ব্যক্তি ও সমাজ কারো পক্ষেই মঙ্গালদায়ক নয়। এই কারণে শিক্ষার ব্যক্তিগত লক্ষ্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তার সামাজিক লক্ষ্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা যেহেতু একটি সামাজিক প্রক্রিয়া সেহেতু সমাজজীবনের বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব যেমন শিক্ষায় রয়েছে আবার শিক্ষার প্রভাব সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে। তাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণের মধ্য দিয়ে সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ইত্যাদিকে অনুধাবন করতে শিক্ষা শিক্ষার্থীকে সাহায্য করে। এইসব সামাজিক রীতিনীতি প্রতিনিয়ত সামাজিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনশীল। শিক্ষার উদ্দেশ্য এই পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থীর অভিযোজন ঘটানো। তাই শিক্ষা কার্যক্রমের পাঠক্রমে বিষয়বস্তুর নিরন্তর পরিমার্জন, পরিশোধন ও সংযোজন ঘটে। অর্থাৎ পাঠক্রম পরিবর্তনশীল ও নমনীয় হওয়া প্রয়োজন যাতে করে ব্যক্তি ও সমাজের অগ্রগতি ও উন্নয়ন অব্যাহত থাকে।

শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটানো। গণতন্ত্র একটি সামাজিক দর্শন, শুধুমাত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা নয়। সুতরাং গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়, প্রতিটি মানুষ যদি গণতান্ত্রিক চেতনার অধিকারী হয় তবেই গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সফল হতে পারে। আর আধুনিক পাঠক্রমে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশে জোর দেওয়া হয়।

ক্রো এবং ক্রো (Crow and Crow) পাঠক্রমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, বিদ্যালয়ের ভিতর ও বাইরে শিক্ষার্থীর সমস্ত অভিজ্ঞতাই পাঠক্রমের অন্তর্গত। এইসব অভিজ্ঞতা এমন একটি কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয় যাতে শিক্ষার্থীর শারীরিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশে সাহায্য করে। নৈতিকবোধ ব্যক্তিগত হলেও সমাজের ভালোমন্দে মুদালিয়র কমিশন ও কোঠারী কমিশনের সুপারিশগুলিতে এই ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে। শুধু তাই নয় সামাজিক প্রয়োজনের কথা মনে রেখে পাঠক্রমে পৌরবিদ্যা (Civics), পরিবেশ বিদ্যা (Environmental studies), নীতিশিক্ষা (Ethics) প্রভৃতি নানা বিষয় শিক্ষার সামাজিক প্রয়োজনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কোঠারী কমিশন সামাজিক প্রয়োজনের কথা মনে রেখে কর্মশিক্ষা (Work education), সমাজসেবা (Social service) ইত্যাদি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

শিক্ষাবিদরা পাঠক্রমের দুটি মাত্রার কথা বলেছেন। এগুলি হল—

বৌদ্ধিকমাত্রা (Intellectual dimension)—জ্ঞান আহরণ, জ্ঞানের আদানপ্রদান, নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে।

সামাজিক মাত্রা (Social dimension)—বহুবিচিত্র সামাজিক সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে পরিবার, সমাজ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে পাঠক্রমে বিষয় সংযুক্তি করার ওপর বিভিন্ন কমিশন জোর দিয়েছে।

পরিশেষে, বলা যেতে পারে যে—শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্যের কথা মনে রেখে পাঠক্রমে বিভিন্ন বিষয়ের সংযুক্তি ঘটেছে।

৭.৬ উপসংহার (Conclusion)

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশ ঘটানো ও এই বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পাঠক্রম শিক্ষার্থীর জীবন ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার জীবনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সামাজিক অভিযোজন ও উন্নয়নের সার্থক রূপ দেবার চেষ্টা করে। জীবনের উৎস ও উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করা যেহেতু দর্শনের কাজ তাই পাঠক্রম জীবনদর্শন দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত। দার্শনিকরা পাঠক্রমের মাধ্যমে মানুষের জীবন ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়বস্তু সংশোধন করার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে কখনও তারা প্রকৃতিবাদ বা বস্তুবাদের ওপর যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন তেমনি আবার কখনও আদর্শবাদের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী পাঠক্রম মূলত তিনপ্রকার দার্শনিক চিন্তায় প্রভাবিত। এগুলি হল—ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ ও প্রয়োগবাদ। ভাববাদীরা পাঠক্রমের মাধ্যমে বৌদ্ধিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, নান্দনিক ইত্যাদি অর্থাৎ জ্ঞান, ধর্ম ও কর্মের উন্নয়ন ঘটানোর কথা বলেছেন। প্রকৃতিবাদীরা শিশুর নিজের প্রকৃতি চাহিদা ও ক্ষমতা অনুযায়ী পরিপূর্ণতা লাভের উদ্দেশ্যে পাঠক্রম নির্ধারণ করার কথা বলেছেন। প্রয়োগবাদীরা মানুষের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারিক উপযোগিতার কথা মনে রেখে পাঠক্রম প্রস্তুত করার কথা বলেছেন।

উপরোক্ত দার্শনিক মতবাদগুলি শিক্ষার্থীর মন ও তার সামাজিক পরিবেশের ভিত্তিতে নানা ভাবধারা দিয়ে প্রভাবিত ও পরিকল্পিত। তাই পাঠক্রমে মনোবিজ্ঞানের ও সমাজবিজ্ঞানের নীতিগুলো বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলেছে। তাই পাঠক্রম রচনার সময় শিক্ষার্থীর বিকাশ, বৃদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, ক্ষমতা, প্রবণতার কথা ইত্যাদি যেমন মনে রাখা দরকার ; তেমনি পাঠক্রমের এই ব্যক্তিমুখী নীতির সাথে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, রীতিনীতি, আত্মীকরণ ও সমাজায়নে অনুপ্রাণিত করার কথা ভাবাও সমানভাবে প্রয়োজন। সঠিক পাঠক্রমে দার্শনিক, মনোবৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্ত্বিক নীতির কার্যকরী সমন্বয় প্রতিফলিত হয়।

৭.৭ প্রশ্নাবলি (Questions)

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay type Questions)

১। পাঠক্রমের ভিত্তি বলতে কী বোঝায়? দর্শন কীভাবে পাঠক্রমকে প্রভাবিত করেছে?

২। পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ আলোচনা করুন।

৩। ভাববাদ ও প্রকৃতিবাদ দর্শন অনুযায়ী পাঠক্রমের লক্ষ্য কী? ভাববাদী ও প্রয়োগবাদী দর্শনের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। পাঠক্রম রচনার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিগুলি কীভাবে পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে প্রতিফলিত করা হয় তা আলোচনা করুন।

৫। পাঠক্রমের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

৬। পাঠক্রম ও সমাজের মধ্যেকার সম্পর্ক কী? পাঠক্রমের সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করুন।

৭। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Questions)

(ক) ভাববাদী দর্শন ও পাঠক্রম।

(খ) প্রয়োগবাদ দর্শন অনুযায়ী পাঠক্রম।

(গ) প্রকৃতিবাদ দর্শন অনুযায়ী পাঠক্রমের বিষয়বস্তু।

(ঘ) পাঠক্রমের মনোবৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি।

একক ৮ ❑ শিখনের তত্ত্ব ও পাঠক্রম (Theories of Learning and Curriculum)

গঠন

৮.১ সূচনা
৮.২ উদ্দেশ্য
৮.৩ শিখনের বৈশিষ্ট্য
৮.৪ শিখনের ধারণা
৮.৫ প্রজ্ঞামূলক বিকাশ তত্ত্ব
৮.৬ পাঠক্রম রচনা ও প্রজ্ঞামূলক বিকাশ তত্ত্ব
৮.৭ শিখনের সংযোজনবাদ তত্ত্ব (Connectionism)
৮.৭.১ প্যাভলভের অনুবর্তন তত্ত্ব
৮.৭.২ থর্নডাইকের প্রচেষ্টা ও ভুলের তত্ত্ব
৮.৭.৩ স্কিনারের সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্ব
৮.৭.৪ পাঠক্রম ও স্কিনারের তত্ত্ব
৮.৮ শিখনের সমগ্রতাবাদ বা সংগঠনবাদ (Insightful Learning or Constructivism)
৮.৯ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেল (Information Processing Model)
৮.১০ উপসংহার
৮.১১ প্রশ্নাবলি

৮.১ সূচনা (Introduction)

শিক্ষা হল সেই প্রক্রিয়া যার সাহায্যে ব্যক্তি নতুন পরিবেশে নতুন আচরণ সম্পন্ন করার দক্ষতা ও কৌশল আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়। শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এই শিক্ষণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষণ

প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য মানুষের আচরণের কাম্য পরিবর্তন ঘটানো যা তার ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের উন্নয়নে সহায়তা করে। এইজন্য নানারকম পদ্ধতি অনুসরণ করে আমাদের শিক্ষা লাভ হয়। এই পাঠের উদ্দেশ্য হল শিখন সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা গড়ে তোলা। আর শিখনের তত্ত্ব কীভাবে পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তা জানানো। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই অধ্যায়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হল।

৮.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তত্ত্বের প্রয়োগ ধারা সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেল জানতে পারবেন।

৮.৩ শিখনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Learning)

১। শিখন ব্যক্তির ক্ষমতা ও বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল।

২। শিখন এক ধরনের বিকাশ।

৩। প্রফুল্ল চিত্তে শিখনের পর তার স্থায়িত্ব অনেক দীর্ঘস্থায়ী হয়।

৪। ব্যক্তি বৈষম্য শিখনের ফলাফলে প্রতিফলিত হয়।

৫। শিখন উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নতুন সম্বন্ধ স্থায়ী করে।

৬। শিখন অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন পরিস্থিতিতে যথাযথ প্রতিক্রিয়া করতে সাহায্য করে।

৭। শিখন নানাবিধ সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করে।

শিখনের তত্ত্ব ও পাঠক্রম ঃ

শিখন হল অভিজ্ঞতালাভের অন্যতম প্রক্রিয়া। শিখনের তত্ত্বগুলি শিখন প্রক্রিয়াকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। এই কারণে শিখনের তত্ত্বগুলি পাঠক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব

বিস্তার করেছে। শিখনের প্রধান তত্ত্বগুলি আলোচনা করলে এই বিষয়টি পরিস্ফুট হবে। শিখনের তত্ত্বগুলি কোন্ কোন্ বিষয়বস্তু শিক্ষার উদ্দেশ্যগত দিক থেকে উপযোগী তা বুঝতে সহায়তা করে। সাধারণভাবে শিখনের তত্ত্ব পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচনে সাহায্য করে। এ ছাড়া শিক্ষামূলক উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশকে সহজতর করে।

৮.৪ শিখনের ধারণা (The Concept of Learning)

শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও শিক্ষা কার্যক্রম সাধনে সহযোগিতা করার লক্ষ্য নিয়েই পাঠক্রম শিক্ষণের আবির্ভাব। শিখন হল সেই প্রক্রিয়া যার সহায়তায় ব্যক্তি নতুন পরিবেশে নতুন আচরণ সম্পন্ন করার দক্ষতা অর্জন করে। শিখনের সময়ে শিক্ষার্থীর আচরণের মধ্যে যে পরিবর্তন তা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের হতে পারে। শিখন দেহে ও মনে পরিবর্তন আনে। শিক্ষার্থীর মানসিক গুণাবলির বিকাশসাধন করে তার উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। শিখনের ফলে ইন্দ্রিয় ও পেশিতে নতুন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। জে. এফ. ট্রেফার (J. F. Trafer, 1972) -এর মতে "শিখন হল একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণ পরিশোধিত হয়" (learning is the process that results in the modification of behaviour)। এম. এল. বিগে (M. L. Bigge, 1979) শিখনকে অন্তর্দৃষ্টি, ব্যবহার, প্রত্যক্ষণ, প্রেষণার পরিবর্তন বা এগুলোর সম্মিলিতভাবে পরিবর্তন (learning may be considered as a change in insights, behaviour, perception, motivation or a combination of these) মনে করেন। শিখন এক ধরনের উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিকাশ। শিখনের সময় শিক্ষার্থীর সক্রিয় ভূমিকা থাকে। শিখনকে অনেক সময় পরিবেশের প্রভাব বলেও অনেকে মনে করেন। শিখনের লক্ষ্য হল জ্ঞান, দক্ষতা ও ভাবের বিকাশ ঘটানো।

৮.৫ প্রজ্ঞামূলক বিকাশ তত্ত্ব (Cognitive Developmental Theories)

সুইস মনোবিজ্ঞানী জ্যাঁ পিঁয়াজের (Jean piaget) শিশুর জীবনবিকাশ সংক্রান্ত মতবাদ পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বিকাশ সংক্রান্ত মতবাদকে দুটি স্ট্র্যাটিজিতে ব্যবহার করা হয়।

১। একটি স্ট্রাটিজি হল শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের স্তর অনুযায়ী পাঠক্রম সাজানো।

২। বৌদ্ধিক বিকাশ ত্বরান্বিত করার জন্য যথাযথ শিক্ষা, যাতে বিকাশ দ্রুত ও ত্বরান্বিত হয়।

পিয়াজেঁর মতে শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গো সঙ্গো সুনির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত ক্রমশ চিন্তা করার বিকাশ হতে থাকে। প্রত্যেক স্তরের বৈশিষ্ট্য হল কিছু ধারণা বা বৌদ্ধিক সংগঠন আয়ত্ত করা, এগুলিকে schema বলা হয়। জ্ঞানের এই একক বা 'schema' একটি ধারণার মানসিক প্রতিরূপ। পাঠক্রমের মধ্যে নতুন জ্ঞান শিশুর 'schema'-এর পরিবর্তন ঘটায়। এই পরিবর্তনই একদিক থেকে দেখতে গেলে শিখন। নতুন জ্ঞান ক্রমাগত schema-এর পরিবর্তন সাধন করছে।

জীবনের অগ্রগতির সঙ্গো সঙ্গো শিক্ষার্থী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। তারা এই অভিজ্ঞতাগুলিকে বর্তমান আচরণ ধারার সাথে আত্মীকরণ করে। আত্মীকরণ (Assimilation) প্রক্রিয়া হল নতুন অভীজ্ঞতাকে অঙ্গীভূত করা। আবার একাজের পুরোনো সংগঠনকে পরিবর্তন করে নিয়ে তাতে নতুন ঘটনা বা অভিজ্ঞতাকে সহযোজন (Accomodation) বা সাঙ্গীকরণ বলে। সহযোজন বা সাঙ্গীকরণ হল একজনের পুরোনো বৌদ্ধিক সংগঠনকে পরিবর্তন করে নিয়ে তাতে নতুন ঘটনা বা অভিজ্ঞতা সুসংবন্ধ করে নেওয়া। সাঙ্গীকরণের অর্থ এককের মধ্যে এমন অভ্যন্তরীণ অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে নতুন তত্ত্বটি সহজেই অঙ্গীভূত হতে পারে। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই পরিবর্তন ঘটে তার অন্যতম হল পৃথকীকরণ (discrimination) ও অভিযোজন (Adaptation). পৃথকীকরণ না হলে কোনো তথ্য কোনো এককের সঙ্গো যুক্ত হবে তা স্থির করা যায় না। অবশ্য পৃথকীকরণের অর্থ এই নয় একবার কোনো তথ্য কোনো একটি এককের সঙ্গো যুক্ত হয়ে গেলে আর পরিবর্তন হবে না। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একটি তথ্য একাধিক এককে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

জীবন বিকাশের প্রতিটি স্তরে শিশুর বুদ্ধিতে একটি সাম্যাবস্থা বজায় থাকে। পরিবেশের মাধ্যমে শিশু যখন নতুন অভিজ্ঞতাগুলি আত্মীকরণ করে সেগুলি স্কিমার সঙ্গো অভিযোজন করে। অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় পর শিশু নতুন অভিজ্ঞতাগুলি আত্মীকরণ করলেও নতুন স্কিমার সঙ্গো সুসংবন্ধ করতে পারে না, তখন শিশুর মধ্যে মানসিক চাপ ও অসাম্য সৃষ্টি হয়। যখন এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন বৌদ্ধিক গতির সৃষ্টি হয় এবং জীবন বিকাশে নতুন মোড় নেয়।

পিয়াজেঁ তার প্রজ্ঞামূলক বিকাশের তত্ত্বে উপরোক্ত ধারণাগুলির বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেইসঙ্গে তাঁর মতে জন্ম পরবর্তীকালে চারটি স্তরের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রজ্ঞামূলক বিকাশ হয়। পিয়াজেঁ এভাবে বৌদ্ধিক

বিকাশকে শ্রেণিকরণ করেছেন যার বৈশিষ্ট্য হল যে প্রত্যেক স্তরে স্কিমার যে রকম বিকাশ হয়, সেই অনুযায়ী শিশু চিন্তন বা বৌদ্ধিক কাজকর্ম করে থাকে। স্তরগুলি হল ঃ

১। সংবেদন ও সঞ্চালনমূলক স্তর (Sensori-Motor-stage)	ঃ	0 থেকে 2 বছর পর্যন্ত
২। প্রাক্ সক্রিয়তা স্তর (Pre-operational stage)	ঃ	2 থেকে 7 বছর বয়স
(a) প্রাক্ ধারণামূলক স্তর (Pre-conceptual thought)	ঃ	2 থেকে 4 বছর বয়স
(b) স্বজ্ঞামূলক চিন্তন স্তর (Intuitive thought)	ঃ	4 থেকে 7 বছর বয়স
৩। সক্রিয় চিন্তন স্তর (Operational stage)	ঃ	7 থেকে 16 বছর
(a) মূর্ত বা বাস্তব চিন্তন স্তর (Concrete Operational stage)	ঃ	7 থেকে 11 বছর
(b) যুক্তি সক্রিয়তার স্তর	ঃ	11 থেকে 16 বছর

পিয়াজেঁ বৌদ্ধিক বিকাশের প্রত্যেকটি স্তরের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। এগুলো হল ঃ

(১) বুদ্ধির সংজ্ঞা হল প্রাপ্ত তথ্যাবলির মাধ্যমে শিশুর আচরণে রূপান্তর ঘটানো। এই প্রক্রিয়া বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হয়। এগুলিকে বলা হয় তথ্য প্রক্রিয়াকরণের যৌক্তিক কাঠামো বা স্কিমা।

(২) বিকাশ শুরু হলে এক স্তরের সক্রিয়তা থেকে অন্যস্তরের সক্রিয়তার সূচনা ঘটে।

(৩) বিকাশের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও পরিমনণের কার্যকরী সমন্বয় ঘটে।

৮.৬ পাঠক্রম রচনা ও প্রজ্ঞামূলক বিকাশতত্ত্ব

প্রথমত পাঠক্রমে কোন কোন বিষয়বস্তুগুলি শিশু তার প্রজ্ঞামূলক বিকাশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আত্মীকরণ করতে পারবে তা প্রথমে নির্বাচন করা হয়। প্রাক্প্রাথমিক স্তরে তাই শিশুদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষণ ক্ষমতার উন্নয়ন ও পরিশীলিত করার উদ্দেশ্যে চিত্র, অঙ্গাসঞ্চালনমূলক খেলা, সংগীত, নৃত্য, গান ইত্যাদি বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচিত করার ওপর শিক্ষাবিদ্রা জোর দেন।

দ্বিতীয় স্তরে শিশুদের মূর্ত বস্তু থেকে ক্রমশ বিমূর্ত চিহ্ন সংকেত ইত্যাদির ব্যবহার ও প্রস্তুতির দিকে জোর দিতে হবে।

তৃতীয় স্তরে মূর্ত বস্তু থেকে বিমূর্ত চিন্তায় উত্তরণ সম্ভব হলে পাঠক্রমে যুক্তি নির্ভর বিষয়বস্তু যেমন পাটিগণিত থেকে বীজগণিত পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

চতুর্থত বা সর্বশেষ স্তরে বিশুদ্ধ যুক্তি নির্ভর বিষয়বস্তুর সংযোজন পাঠক্রমে হওয়া উচিত যাতে করে শিশুর বিমূর্ত চিন্তন, নিজস্ব প্রবণতার উন্নয়ন ও উৎকর্ষ বিকাশে সহায়তা ঘটানো সম্ভব হয়।

অবশ্য পিয়াজেঁর তত্ত্ব সার্বজনীন স্বীকৃত হয়নি। মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে দেখেছেন যে, এই বিন্যাসের স্তরগুলি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাঁদের মতে প্রজ্ঞামূলক বিকাশের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বিষয়বস্তু ও অভিজ্ঞতার কার্যকরী সমন্বয়ের ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।

৮.৭ শিখনের সংযোজনবাদ তত্ত্ব (Connectionism Theories of Learning)

শিখনের তত্ত্ব প্রথমদিকে ছিল আচরণবাদী মত নির্ভর। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর যে আচরণ বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করা যায় সেই আচরণে বাঞ্ছিত কোনো পরিবর্তনকেই বলা হয় শিখন। এই পরিবর্তন ঘটানোর জন্য যে উদ্দীপক উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করা হয়, তার সঙ্গো প্রত্যাশিত আচরণের সংযোগকেই বলা হয় শিখন।

প্যাভলভের অনুর্বতন তত্ত্ব, থর্নডাইকের মতবাদও স্কিনারের মতবাদকে বলা হয়। অর্থাৎ সংযোজনবাদীদের তত্ত্বের মূলভিত্তি নীচে উপস্থাপিত করা হল ঃ

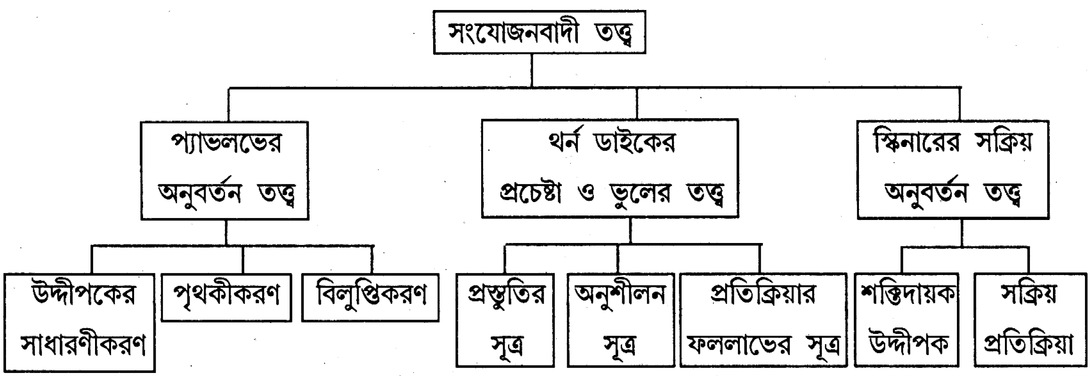

ছক : ৮(১) সংযোজনবাদীদের মতবাদের ভিত্তি শিখনের মূলস্তর উপস্থাপিত করা হল।

৮.৭.১ প্যাভলভের অনুবর্তন তত্ত্ব (Condition Reflex Theory of Learning)

প্যাভলভের মতে সবরকম শিখনের মূল সূত্র হল সাপেক্ষীকরণ বা অনাপেক্ষীকরণ (conditioning and deconditioning)। এই মতামত অনুসারে সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ উদ্দীপক যদি

বার বার একইসঙ্গো উপস্থিত করা হয় তাহলে কেবলমাত্র সাপেক্ষ উদ্দীপক বা কৃত্রিম উদ্দীপকটি উপস্থাপিত করেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা যেতে পারে। একটি কুকুরের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে প্যাভলভ দেখেছিলেন যে কুকুরকে খাদ্য দেবার আগে যদি নিয়মিতভাবে ঘন্টা বাজানো হয়, তাহলে ঘন্টা বাজানোর শব্দ শুনেই কুকুরের মুখে লালা বের হয়ে যাবে। প্যাভলভের মতে তিনটি বিশেষ ধারণা অনুবর্তনজাত শিখনের সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত। যেমন—

উদ্দীপকের সাধারণীকরণ (Stimulus generalization)—যখন কোনো প্রাণী একটি উদ্দীপকের পর স্বাভাবিকভাবে অন্য একটি উদ্দীপক প্রত্যাশা করে এবং সেই প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া করে, তখন তাকে বলা হয় উদ্দীপকের সাধারণীকরণ। যেমন—কুকুরটি ঘণ্টা ধ্বনির সঙ্গো খাদ্য প্রত্যাশা করায় লালা নিঃসরণ করে। এখানে ঘণ্টাধ্বনি নামক উদ্দীপকের সাধারণীকরণ হল।

পৃথকীকরণ (Discrimination) ঃ সাধারণীকরণের পূর্বে প্রয়োজন হয় ফলদায়ক উদ্দীপকের সঙ্গো অন্য উদ্দীপকের পার্থক্য নির্ণয় করা বা উপস্থিত অন্য উদ্দীপক থেকে ফলদায়ক উদ্দীপককে পৃথকীকরণ।

বিলুপ্তিকরণ (Extinction) ঃ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক উদ্দীপকের বিলুপ্তি ঘটিয়ে স্থায়ীভাবে অনুবর্তিত উদ্দীপকের সঙ্গো স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার সংযোগসাধনই অনুবর্তন।

পাঠক্রমের ওপর এই তত্ত্বের প্রভাব প্রায় নেই বললেই চলে। তবে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর পারস্পরিক বা সাংগঠনিক দিক থেকে শিক্ষার্থীর কাছে অভিজ্ঞতাগুলি কীভাবে স্থায়িত্ব লাভ করবে এবং কীভাবে মধ্যবর্তী অভিজ্ঞতার অবলুপ্তি ঘটিয়ে চূড়ান্ত শিখন সম্পন্ন হবে তার আভাস পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৮.৭.২ থর্নডাইকের প্রচেষ্টা ও ভুলের তত্ত্ব (Thorndike's Theory of Trial and Error)

এই তত্ত্বের মূলকথা হল শিখন একটি উদ্দীপকের সঙ্গো, নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার সংযোগসাধন। বারবার ভুল আচরণ করতে করতে শেষে প্রত্যাশিত আচরণ সম্পন্ন হয়। আর উদ্দিষ্ট সংযোগ তখন ধীরে ধীরে স্থায়ী হয়। তাঁর মতে এই সংযোগ স্থায়ী হওয়ার সূত্র হচ্ছে,

(১) প্রথম সূত্রটি হল প্রস্তুতি সূত্র (Law of readiness)

উদ্দীপক ও তার উপযোগী প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। শেখার জন্য শিক্ষার্থীর মনে প্রস্তুতি থাকলে প্রতিক্রিয়া

আনন্দদায়ক হয়। আর মানসিক প্রস্তুতি না থাকলে কাজটি শিক্ষার্থীর কাছে বিরক্তিকর মনে হবে। পাঠক্রমে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই সূত্র বিশেষ ভূমিকা নেয়। পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয়টি শিক্ষার্থীর পূর্বোক্ত ধারণা বা প্রস্তুতির ভিত্তিতে স্থির করা উচিত।

(২) দ্বিতীয় সূত্রটি হল অনুশীলনের সূত্র (Law of exercise)

ফলদায়ক প্রতিক্রিয়া বারবার করতে করতে ক্রমশ উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক স্থায়ী বা সুদৃঢ় হয়। আবার প্রতিক্রিয়া করায় দীর্ঘকাল বিরত থাকলে সংযোগ শিথিল হয়ে যায়। এই সূত্রটির মূল বক্তব্য হল অনুশীলন (exercise practice) উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী করে। শিক্ষার্থীর শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই সূত্রটির বিশেষ প্রয়োগ আমরা লক্ষ্য করি। কবিতা মুখস্থ করা, ভাষা শেখা, গান শেখা, গাড়ি চালানো, টাইপ করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনুশীলন কাজটি নিয়মিত করলে যথাযথভাবে কাজ করতে সহায়তা করে। এই সূত্রকে ভিত্তি করে পাঠক্রমে 'পাঠ' শেষে অনুশীলন সংযুক্তি হয়। গণিত ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনুশীলনের সুযোগ আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(৩) ফললাভের সূত্র (Law of effect) ঃ

একই অবস্থায় একটি কাজ বারবার করার ফলে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সংযোগ স্থাপিত হয়, সেই সংযোগটি শিক্ষার্থীর কাছে সন্তোষজনক হয় তবে উক্ত প্রতিক্রিয়ার সঙ্গো সংযুক্ত উদ্দীপকের সংযোগ স্থায়ী হয়। এই সূত্রকে অনেক সময় পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কিত নিয়ম (Law of reward and punishment) হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

থর্নডাইকের সবচেয়ে বড়ো অবদান তার ফললাভের সূত্র। পাঠক্রমের ওপর এর কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পাঠক্রমে বিষয়বস্তু সাজানোর সময় এমনভাবে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয় যে শিক্ষার্থী পূর্ববর্তী শিখনের সঙ্গো পরবর্তী শিখনের সংযোগসাধন করে এক ধরনের সন্তুষ্টি লাভ করে।

৮.৭.৩ স্কিনারের সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্ব (Skinner's Operant Conditionning)

স্কিনার বিশ্বাস করতেন বেশিরভাগ প্রতিক্রিয়া কিছুতেই কোনো জ্ঞাত উদ্দীপক দ্বারা জাগ্রত হতে পারে না। স্কিনার উদ্দীপক না থাকলে প্রতিক্রিয়াও অনুপস্থিত এই তত্ত্বের বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রাধান্য দেন স্বতঃক্রিয়ামূলক আচরণের দিকে যা কোনো উদ্দীপক দ্বারা সৃষ্টি নয়। এটি প্রতিক্রিয়াজাত

অনুবর্তন নামে পরিচিত। তিনি মনে করেন শিক্ষার্থীর উত্তরকে শিক্ষক যদি অনুমোদন করেন তবে এই উত্তরটি স্থায়ীভাবে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া হিসেবে কাজ করে। সুতরাং শিক্ষকের অনুমোদনসূচক বাক্য বা ইঙ্গিত শক্তিদায়ক উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার এই সম্পর্ক স্থাপনে শক্তিদায়ক উদ্দীপকের ভূমিকা এবং তারই ভিত্তিতে ধারাবাহিক আচরণের পরিবর্তন সাধন, স্কিনারের তত্ত্বের সবচেয়ে বড় অবদান।

৮.৭.৪ পাঠক্রম ও স্কিনারের তত্ত্ব

স্কিনারের তত্ত্ব পাঠক্রমে শিক্ষণ পদ্ধতির এক বিশেষ দিক উন্মোচিত করে। তারই তত্ত্বের ভিত্তিতে তৈরি হয় সূচিবদ্ধ শিক্ষণ (programmed instruction) পদ্ধতি। এই পদ্ধতি বিশেষ মৌলিক নীতির ভিত্তিতে প্রস্তুত। এগুলি হল ঃ

(১) ক্ষুদ্র ধাপের নীতি (principle of small step)—পাঠক্রমে বিষয়বস্তুকে কতকগুলো অর্থবহ খণ্ডে বিভক্ত করা হয়। শিক্ষার্থীর একটি ধারণা সম্পূর্ণ শেখা হলে তবেই পরবর্তী ধারণা শেখায় অগ্রসর হবে। বিজ্ঞান, গণিত, ব্যাকরণ ইত্যাদি শেখার সময় পাঠক্রমে বিষয়কে ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করে ক্রমান্বয়ে সাজানো হয়।

(২) নিজ গতিতে শেখা (Self pacing in learning)—শিক্ষার্থী তার নিজের ক্ষমতানুযায়ী যতটা শেখা যায় ততটাই শিখবে।

(৩) সক্রিয় প্রত্যুত্তর দান (Active responding)—শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে প্রতিটি পর্যায়ে প্রত্যুত্তর দেবে।

(৪) তাৎক্ষণিক প্রতি সংকেত (Immediate feed back)—প্রতিটি প্রতিক্রিয়ার ভালোমন্দ, শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা তাৎক্ষণিক জানিয়ে দেবে।

৮.৮ শিখনের সমগ্রতাবাদ বা সংগঠনবাদ (Insightful Learning or Constructivism)

শিখনের প্রজ্ঞামূলক সংগঠন তথা সমগ্রতাবাদের ওপর গেস্টাল্টবাদীরা বিশেষ জোর দিয়েছেন। গেস্টাল্ট বা সমগ্রবাদীদের মতে আমরা যখন কোনো বিষয় প্রত্যক্ষ করি, তখন বিষয়টিকে ছোটো ছোটো অংশে প্রত্যক্ষ না করে সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করে থাকি।

গেস্টাল্টবাদীদের মতে শিক্ষণ প্রক্রিয়া হল অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে কোনো বিশেষ সমস্যার পূর্ণ স্বরূপ বুঝে নিয়ে কীভাবে প্রতিক্রিয়া করতে হবে তা জেনে নেওয়া এবং অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে কোনো সমস্যার বিচ্ছিন্ন অংশের সঙ্গে পূর্ণ সমস্যাটির সম্বন্ধ সমগ্রভাবে উপলব্ধি করা। তাই শিক্ষণ হল সমগ্র ও অংশের পারস্পরিক সংযোগ অবধারণ করা, অবশ্য এই অবধারণ শিক্ষার্থীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই সংগঠিত হয়ে থাকে। কাজেই শিক্ষণ প্রক্রিয়া কোনো অন্ধ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, এ হল সমগ্র পরিস্থিতি বা সমস্যা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি। গেস্টাল্ট তত্ত্বের অন্তর্দৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে আকস্মিক একটি সাংগঠনিক পরিবর্তন যা একটি নতুন ধারণার জন্ম দেয়।

সাংগঠনিক পরিবর্তনের কয়েকটি প্রাথমিক শর্ত তারা বলেছেন। এগুলি হল—

(১) সাদৃশ্য (similarity)—অর্থাৎ সদৃশ অভিজ্ঞতাগুলি সহজেই সংগঠিত হয়ে একটি এককে পরিণত হয়।

(২) নৈকট্য (proximity)—কাছাকাছি অভিজ্ঞতাগুলি সহজেই একটি এককে পরিণত হয়।

(৩) পরিচিতি (familiarity)—চেনা বা জ্ঞান বিষয়ে সংগঠন সহজে হয়।

(৪) সংযুক্তি (contiginity)—যদি অভিজ্ঞতাগুলি কোনোভাবে সংযুক্ত হয় তাহলে এই ধারাবাহিকতা সহজেই অভিজ্ঞতাকে সংগঠিত করে।

এই শর্ত বা নীতিগুলি এবং গেস্টাল্ট তত্ত্বের মূলকথা সামগ্রিক (wholeness) ও সংগঠন একত্রিত করলে পাঠক্রমের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। এগুলি হল—

প্রথমতঃ পাঠক্রমে বিষয়বস্তু এমনভাবে নির্ধারণ করা উচিত যাতে করে চেনা থেকে ক্রমশ অজানা বা অপরিচিত বিষয়ের দিকে শিক্ষার্থী অগ্রসর হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ সদৃশ বা একগোত্রীয় বিষয়বস্তু একই জায়গায় সংগঠিত হয়।

তৃতীয়তঃ পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা যেন সরল সংগঠন থেকে জটিল সংগঠনের দিকে প্রসারিত করা যায়।

চতুর্থতঃ বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা যেন বজায় থাকে।

পঞ্চমতঃ কোনো একটি বিষয়ের জ্ঞান হবে অন্তত সেই স্তরের জন্য সম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ বিষয়ের সংগঠন, শিখনের অন্তরায়।

আসলে সংগঠনবাদ মূলত পাঠক্রমের পাঠ্যবিষয়ের অর্থ উপলব্ধি সংগঠন ও সংহতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষণ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিক্ষার্থীর অন্তর্দৃষ্টি অর্থাৎ তার সহজাত প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে জোর দেওয়া। আর এইজন্য অনুকূল শিক্ষণ পরিমণ্ডল তৈরি করা যাতে তার প্রত্যাশিত আচরণকে সহায়তা করা, পরিচালিত করা, উৎসাহিত করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ পাঠক্রমের বিষয়বস্তু, অভিজ্ঞতা ও পদ্ধতি শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি, বিচারবুদ্ধি ও চিন্তার ক্ষমতাকে উন্নত করতে চায় ও তার উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করে।

৮.৯ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেল (Information Processing Model)

শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষণ মডেলের অন্য একটি উৎস হল শিক্ষার্থীর তথ্য প্রক্রিয়াকরণের সামর্থ্য। এই মডেল শিক্ষার্থী কীভাবে উদ্দীপকসমূহকে নাড়াচাড়া করে, তথ্য সংগ্রহ করে, তথ্য সংগঠন করে তথ্যবিন্যাস করে, সমস্যার ইঙ্গিত পাওয়ার চেষ্টা করে, তথ্যাবলি বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করার ক্ষমতা ইত্যাদির ওপর জোর দেয়। এই প্রক্রিয়াকরণ মডেল অনুযায়ী পাঠক্রমে বৌদ্ধিক ক্ষমতা ও সৃজনীশক্তি বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ডেভিড আসুবেল, ব্রুনার, রিচার্ড সার্চম্যান প্রমুখ শিক্ষাবিদরা হলেন এই মডেলের প্রবক্তা, ব্রুনার ধারণা গঠন (concept attainment model)-এ মূলত আরোহীমূলক (inductive) চিন্তন ও ধারণা সংক্রান্ত বিকাশে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং পঠনপাঠনের মাধ্যমে যুক্তি শক্তিবিকাশে গুরুত্ব দেন। আবার জোসেফ জে এজলুকাস বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে অনুসন্ধান ও স্মরণমূলক বিকাশে গুরত্ব দেন।

ব্রুনার তার মডেল অনুযায়ী পাঠক্রম রচনার সময় চারটি ব্যাপারে জোর দিতে বলেছেন।

(১) বৈপরীত্যে জোর দেওয়া (emphasising contrast) ঃ যেমন রাত ও দিন, সাদা ও কালো, বর্তমান ও অতীত, শিশু ও পরিণত মানুষ ইত্যাদি বৈপরীত্য।

(২) তথ্য অনুমান করায় উৎসাহ দান (stimulating information guessing) ঃ পাঠক্রমে বা শিক্ষণ পদ্ধতিতে প্রথমে শিশুদের নিজের ধারণা ব্যক্ত করায় উৎসাহ দিতে হবে। পরে প্রকৃত তথ্য পরিবেশন করা।

(৩) তথ্য সংগ্রহে সক্রিয় অংশগ্রহণ (encouraging participation) ঃ হাতেকলমে প্রকৃতি বা অন্য জায়গা থেকে শিক্ষার্থী অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহকরণে জোর দেওয়া।

(৪) সচেতনতা জাগ্রত করা (Awareness building) ঃ শিক্ষার্থীর নিজ পরিবেশ ও নানা সমস্যা সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করার সুযোগ ও শিক্ষণ পরিমণ্ডল প্রস্তুতিতে জোর দিতে হবে।

৮.১০ উপসংহার (Conclusion)

এই পাঠে শিক্ষণ ও পাঠক্রম সম্পর্কীয় বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এইসব তত্ত্বগুলির সঙ্গে পাঠক্রমের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। শিক্ষণ প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে এইসব তত্ত্বের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। সংযোগবাদীরা যেখানে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যথাযথ সম্বন্ধ স্থাপনে গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি আবার সমগ্রবাদীরা পাঠক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতিতে অর্থ উপলব্ধি সংগঠন ও সংহতির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন ও সঙ্গে শিক্ষার্থীর অন্তর্দৃষ্টি বিকাশে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিখনের প্রজ্ঞামূলক বিকাশতত্ত্বে শিক্ষার্থীর বিকাশের স্তর অনুযায়ী পাঠক্রম সাজানো ও বিকাশকে দ্রুত ত্বরান্বিত করার জন্য বিষয়বস্তু ও অভিজ্ঞতার সংযুক্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেল আবার পাঠক্রমের সাহায্যে শিশুর বৌদ্ধিক ক্ষমতা, কৌতুহল স্পৃহা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও মানসিক চিন্তন ক্ষমতা বিকাশে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছে। পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে এইসব তত্ত্বগুলি বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করলেও এইসব মতবাদ কোনোটিই এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। উপযুক্ত পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে এদের কার্যকরী সমন্বয় প্রয়োজন।

৮.১১ প্রশ্নাবলি (Questions)

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay type Questions)

১। শিখন বলতে কী বোঝায়? পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে শিখনের তত্ত্বগুলির প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

২। শিখনের সমগ্রবাদ তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? পাঠক্রম রচনায় এই তত্ত্বের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করুন।

৩। শিখনের সংযোগবাদ তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? পাঠক্রম প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব কী কী নীতির ওপর জোর দিয়েছে তা উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৪। থর্নডাইকের শিখন সম্বন্ধে প্রচেষ্টা ও ভুল তত্ত্বের আলোচনা করুন। পাঠক্রম প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা ব্যাখ্যা করুন।

৫। প্রজ্ঞামূলক বিকাশতত্ত্ব কী? পাঠক্রম প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব কীভাবে ব্যবহার হবে তা আলোচনা করুন।

৬। স্কিনারের সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? পাঠক্রমের উপাদান নির্বাচন ও বিন্যাসে এই তত্ত্ব কীভাবে ব্যবহার করা যাবে?

৭। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Questions)

(ক) শিখনের সংযোগবাদতত্ত্ব।

(খ) প্রজ্ঞামূলক বিকাশতত্ত্ব।

(গ) পাঠক্রম ও সমগ্রতাবাদ।

(ঘ) শিখনের সমগ্রতাবাদ।

(ঙ) শিখনের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেল।

(চ) শিখনের তত্ত্ব ও পাঠক্রম।

একক ৯ ❑ পাঠক্রম রচনা (Curriculum Construction)

গঠন

৯.১ সূচনা

৯.২ উদ্দেশ্য

৯.৩ পাঠক্রম রচনার নীতি সমূহ

৯.৩.১ পাঠক্রমে উপাদান নির্বাচন নীতি

৯.৩.২ পাঠক্রমে উপাদান বিন্যাস নীতি

৯.৩.৩ পাঠক্রমে ক্রিয়াগত নীতি

৯.৪ পাঠক্রমে শিক্ষার লক্ষ্যের শ্রেণিবিন্যাস

৯.৪.১ শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা

৯.৪.২ শিক্ষার লক্ষ্য ও তার শ্রেণিবিভাগ

৯.৪.৩ জ্ঞানবর্গের লক্ষ্য সমূহ

৯.৪.৪ প্রাক্ষোভিক বা অনুভবমূলক লক্ষ্য

৯.৪.৫ সঞ্চালন বর্গের লক্ষ্য

৯.৫ পাঠক্রম রচনা এবং সিস্টেম পদ্ধতি

৯.৫.১ সিস্টেম পদ্ধতির ধারণাগত ভিত্তি

৯.৫.২ সিস্টেম পদ্ধতির পাঠক্রম রচনার পর্যায়ক্রম

৯.৬ উপসংহার

৯.৭ প্রশ্নাবলি

৯.১ সূচনা (Introduction)

পাঠক্রম শিক্ষার একটি অত্যন্ত গুরুত্ব উপাদান। পাঠক্রমের যোগ্যতার ওপর নির্ভর করছে শিক্ষা কর্মসূচির সফলতা। তাই সমাজের প্রয়োজন ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে দার্শনিক, মনোবৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্ত্বিক মতবাদের ভিত্তিতে প্রভাবিত হয়েছে পাঠক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এইসব মতবাদের প্রেক্ষিতে নির্বাচিত হয়েছে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিক্ষণ পদ্ধতি ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি। তার ফলশ্রুতি হিসেবে এসেছে বিষয়ভিত্তিক, জীবনভিত্তিক, কর্মভিত্তিক, অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রম ইত্যাদির চিন্তাধারা। এ ছাড়া পাঠক্রম রচনায় প্রভাব ফেলেছে শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব। পাঠক্রমের লক্ষ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টি ও শিখনের নানা তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রস্তুত হয়েছে পাঠক্রম রচনার নীতি সমূহ-উপাদান নির্বাচনের নীতি, পাঠক্রমের উপাদান বিন্যাসের নীতি, পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচন ও তার শ্রেণিবিন্যাস নীতি ইত্যাদি। এই অধ্যায়ে এইসব ব্যাপারে আলোচনা করা হবে।

৯.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে, শিক্ষার্থীরা—

- পাঠক্রম রচনার নীতি নির্ধারণ করতে পারবেন।
- পাঠক্রমে শিক্ষার লক্ষ্যের শ্রেণিবিন্যাস সম্বন্ধে সম্যক ধারণা উপলব্ধ করতে পারবেন।
- পাঠক্রম রচনা ও সিস্টেম পদ্ধতির সঠিক বর্ণনা দিতে পারবেন।

৯.৩ পাঠক্রম রচনার নীতি সমূহ (Principles of Curriculum Construction)

আধুনিককালে, শিক্ষা বিজ্ঞানে পাঠক্রম রচনা ও তার বাস্তব রূপায়ণের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাঠক্রম রচনার ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করার সময় আমরা দেখেছি পাঠক্রমের বিষয়বস্তু কখনও গুরুত্ব পেয়েছে জ্ঞান বৃদ্ধির ওপর আবার কখনও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থীর জীবনের অভিজ্ঞতা, আবেগ ও সমাজজীবনের অভিযোজনের ওপর। বিভিন্ন শিক্ষা দার্শনিক তাদের মতামতের পার্থক্য সত্ত্বেও পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেন। এগুলি হল—

(১) পাঠক্রমে বিষয় নির্বাচনের নীতি

(২) পাঠক্রমে বিষয় বিন্যাসের নীতি

অবশ্য পাঠক্রম রচনার সময় তার বাস্তব উপযোগিতা ও সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। আধুনিককালে তাই পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষাবিদরা ক্রিয়াগত নীতি (Operational principle)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। এই তিন নীতির পারস্পরিক সম্পর্ক নীচে ছকাকারে দেখানো হল।

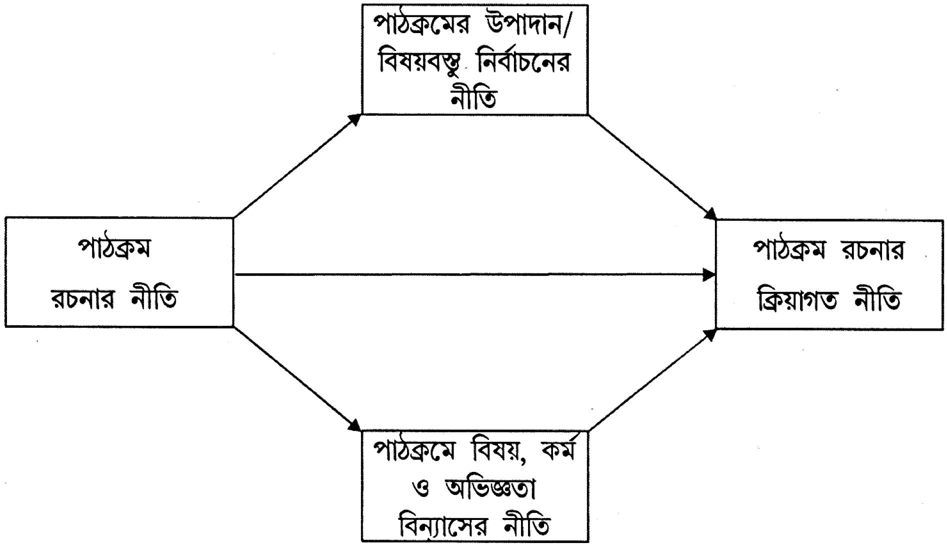

চিত্র ৯.১ ঃ পাঠক্রম রচনার নীতিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক

৯.৩.১. পাঠক্রমে উপাদান নির্বাচন নীতি ঃ (Principle for Selection of Contents in Curriculum)

শিক্ষাবিদরা বিভিন্ন সময়ে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে কয়েকটি নীতির উল্লেখ করেছেন। তাদের নিম্নলিখিত নীতিগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) উদ্দেশ্য কেন্দ্রিকতার নীতি (Principles of objective centredness) ঃ এই নীতিটি শিক্ষার মূল লক্ষ্যের সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত। এই নীতি অনুযায়ী পাঠক্রমের উপাদান—বিষয়, কর্ম ও অভিজ্ঞতা শিক্ষার মূল লক্ষ্যের সহায়ক হতে হবে। তাই বিষয় নির্বাচন করার সময় মূল লক্ষ্য বিশ্লেষণ প্রথমে প্রয়োজন। তারই ভিত্তিতে পরে বিষয় নির্বাচন করা দরকার। যেমন শিক্ষার লক্ষ্য যদি হয় ব্যক্তিগত উৎকর্ষসাধন তাহলে পাঠক্রমে শারীরচর্চা, বৌদ্ধিক বিকাশ, অনুসন্ধিৎসা, প্রবণতা, স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষা অন্তর্দৃষ্টি বিকাশ ও দক্ষতা অর্জনে জোর দেওয়া প্রয়োজন। এই নীতি অনুসরণ করলে সমগ্র পাঠক্রমটি শিক্ষার উদ্দেশ্যমুখী হবে এবং পাঠক্রমটি তার উদ্দেশ্য সফলে সক্ষম হবে।

(২) **শিশু কেন্দ্রিকতার নীতি (Principles of child centredness)** ঃ আধুনিককালে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটানো। তাই শিশুর প্রজ্ঞা বিকাশের স্তর, আগ্রহ, প্রবণতা, প্রেষণা, চাহিদা ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠক্রমে বিষয় ও পাঠ প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

(৩) **সমাজ কেন্দ্রিকতার নীতি (Principle of community centredness)** ঃ শিক্ষার মূল লক্ষ্য ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক পরিবর্তন ঘটানো এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা। তাই আধুনিককালে পাঠক্রমে বিষয় নির্বাচনের সময় একদিকে যেমন ব্যক্তির উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে অন্যদিকে এই বিষয়বস্তু সংযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থী যাতে সমাজে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। সমাজের প্রয়োজন হল পারস্পরিক সম্প্রীতি রক্ষা, অভিযোজন, আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা, উৎপাদন ও উন্নয়ন অব্যাহত রাখার জন্য শিক্ষার্থীকে উদ্যোগী করা, তাই উপযুক্ত বিষয় নির্বাচন করে শিশুর চাহিদা ও সামাজিক চাহিদা পূরণ করতে হবে।

(৪) **সংরক্ষণের নীতি (Principles of conservation)** ঃ শিক্ষার মাধ্যমে অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ এবং তার সঞ্চালন পাঠক্রমের অন্যতম বিশেষ লক্ষ্য। এর জন্য পাঠক্রমে মানবজাতির পূর্ণ অভিজ্ঞতাগুলি সঠিকভাবে প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। এর মূলকথা হল জাতীয় কৃষ্টির সব অভিজ্ঞতাগুলিকে উপযুক্ত বিষয়ের মাধ্যমে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তি করা প্রয়োজন।

(৫) **অগ্রমুখিতার নীতি (Principles of forwardness)** ঃ এই নীতি অনুযায়ী বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষার্থীকে সচেতন, দক্ষ ও উপযোগী করার দিকে নজর দিতে বলা হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ, আর্থসামাজিক পরিবর্তন, বিশ্বায়নের গতিমুখ তথ্য ও প্রযুক্তি ইত্যাদির কথা মনে রেখে পাঠক্রমে প্রয়োজনমাফিক এসব বিষয় ও উন্নয়নের নীতি সম্পর্কিত বিষয়বস্তু সংযুক্তিতে নজর দেওয়া হয়।

(৬) **সৃজনশীলতার নীতি (Principles of creativeness)** ঃ শিক্ষার মাধ্যমে সৃজনশীলতার পরিপোষণ ও বিকাশ ঘটানো শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে পরিগণিত হয়। তাই পাঠক্রমে বিষয়বস্তু এমনভাবে নির্বাচিত হবে যে তার সৃজনীপ্রতিভা ও অনুসন্ধিৎসা বিকাশে সহায়ক হয়। তাই শিল্প ও সাহিত্যচর্চা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণা ইত্যাদি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

(৭) বৃত্তিমুখি নীতি (Principles of job orientation) ঃ পাঠক্রমের সাহায্যে জীবন ও জীবিকার প্রয়োজন যাতে মেটে সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। তাই শিক্ষার্থীর চাহিদা, ক্ষমতা, জীবিকার সুযোগ ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বৃত্তিগুলি নির্ধারণ করা উচিত। পরে এইসব বৃত্তির সহায়ক উপযুক্ত বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

৯.৩.২ পাঠক্রমে উপাদান বিন্যাস নীতি (Principles Organisation of Elements in Curriculum)

পাঠক্রমে বিষয়বস্তু বিচ্ছিন্নভাবে না রেখে সুনির্দিষ্ট বিন্যাস প্রয়োজন। এ ব্যাপারে শিক্ষাবিদরা দুটি নীতির কথা বলেছেন। এগুলি হল—

(১) সম্বন্ধের নীতি (Principles of integration) ঃ পাঠক্রম রচনার সময় দুই ধরনের সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে। এগুলি যেমন—প্রথমত, পাঠক্রমে শিশুর বৈশিষ্ট্য, সামাজিক চাহিদা, জীবনমুখী অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটানো, অন্যটি নির্বাচিত বিষয়বস্তুর মধ্যে একটা সংহতি (correlation) বজায় রাখা। যেমন—জীবনবিজ্ঞানের (life science) ক্ষেত্রে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ও শারীরবিদ্যার বিষয়কে একত্রিত করে একটি সমন্বয়িত বিষয়ে পরিণত করা হয়। পাঠক্রমের এই নীতিকে principles of integration বলা হয়। এই নীতি অনুযায়ী পাঠক্রমে একটি সংগতি আসে ও শিক্ষার্থী একটি সামগ্রিক ধারণা নিতে সক্ষম হয়। কেন্দ্রীয় পাঠক্রমে (Core curriculum) এই নীতি অনুসৃত হয়।

(২) ক্রমবিন্যাসের নীতি (Princciples of item/Content arrangement) ঃ শিক্ষণ তত্ত্বগুলি পর্যালোচনা করলে আমরা এই নীতি দেখতে পাই। পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের স্তর অনুযায়ী বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্তি হওয়া প্রয়োজন। এই ব্যাপারে শিখনের প্রজ্ঞামূলক বিকাশের নীতিকে সামনে রেখে বিষয়বস্তুর বিন্যাস হলে ভালো। তা ছাড়া বিষয়বস্তু চেনা থেকে অচেনা জ্ঞান আহরণে, সহজ থেকে জটিল বিষয়ের দিকে নিয়ে যেতে হবে। এ ব্যাপারে স্কিনার ও থর্নডাইকের শিক্ষণ তত্ত্বের ভিত্তিতে বিষয় অন্তর্ভুক্তি হলে ভালো। এ ছাড়া শিক্ষার্থীর পরিণমনের মান ভিত্তিতে বিষয়বস্তুর অর্থবহ উপলব্ধির সংগঠন ও সংগতির ওপর জোর দিয়ে বিষয়বস্তুর কাঠিন্য (difficulty level) নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। এইভাবে বিষয়বস্তু পাঠক্রমে বিন্যাস হলে শিশুর কাছে এর উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে।

৯.৩.৩ পাঠক্রমে ক্রিয়াগত নীতি (Operational Principles of Curriculum)

কোনো পাঠক্রমের সাফল্য নির্ভর করে ব্যাবহারিক উপযোগিতা ও প্রায়োগিক কৌশলের ওপর। এই ব্যাপারে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, এন.সি.আর.টি. ও বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন নানারকম নীতির কথা বলেছেন। এই নীতিগুলি নিম্নলিখিত প্রকার ঃ—

(ক) **সক্রিয়তার নীতি** (Principles of dynamicism) ঃ এই নীতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়, মন, বৃদ্ধি, বুদ্ধি, দেহ ইত্যাদির সক্রিয়তার জন্য পাঠক্রমে বিষয় নির্বাচনে জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এখানে পাঠক্রমের বাস্তব ও জীবনমুখী বিষয় ও অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষার্থীর উপরোক্ত সামগ্রিক সক্রিয়তার ও পরিপূর্ণতার উদ্দেশ্যে বিষয় অন্তর্ভুক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

(খ) **নমনীয়তার নীতি** (Principles of variability or flexibility) ঃ একবার পাঠক্রম প্রস্তুত হয়ে গেলে চিরকালের জন্য চলতে পারে না। শিক্ষার্থীর চাহিদা, সামাজিক চাহিদা, মানবসম্পদ উন্নয়ন নীতি ইত্যাদির সঙ্গে ভারসাম্য পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাস, সংযোজন ও পরিমার্জন হওয়া প্রয়োজন। নমনীয়তার মাধ্যমে পাঠক্রমে বৈচিত্র্যতা আনা যায়। নমনীয়তার আরেকটি শর্ত হল, পাঠক্রমের মূল কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যৌথ উদ্যোগে প্রতিনিয়ত পঠনপাঠনে নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যোগ করা।

পাঠক্রম রচনা করা একার কাজ নয়। একাজে শিক্ষক, পরিচালক, পুস্তক প্রস্তুতকারক, নীতি নির্ধারক প্রমুখ ব্যক্তিদের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। পাঠক্রম প্রস্তুত করার সময় শিক্ষার্থীর মানসিক দিকের সঙ্গে পরিস্থিতির ভারসাম্য রেখে পাঠক্রম প্রস্তুত করা প্রয়োজন। অর্থাৎ পাঠক্রমে জীবনভিত্তিক ও পরিবেশভিত্তিক বিষয় ও অভিজ্ঞতার সঠিক মেলবন্ধন ঘটানো দরকার।

৯.৪ পাঠক্রমে শিক্ষার লক্ষ্যের শ্রেণিবিন্যাস (Taxonomies of Educational Objectives of Curriculum)

৯.৪.১ শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা (Concept of Educational Objectives)

শিক্ষা একটি বৃহৎ ও সামগ্রিক ধারণা। শিক্ষার বৃহত্তর উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন পাঠক্রমে তার প্রতিফলন ঘটা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু একজন শিক্ষক যখন দৈনন্দিন পঠনপাঠনের পরিকল্পনা রচনা করেন বা পরিচালনা করেন তার পক্ষে তখন শিক্ষার বৃহত্তর বা সঠিক উদ্দেশ্য অর্জন করার বিষয়টি

প্রায় অসম্ভব প্রয়াস ছাড়া কিছু নয়। কারণ সার্বিক উদ্দেশ্য একটি জীবনব্যাপী প্রয়াস। স্কুলের প্রতিদিনের পঠনপাঠনে, একটি মাস, একটি বৎসর বা সমগ্র বিদ্যালয় জীবনেও এই অন্তিম উদ্দেশ্যের কয়েকটি পদক্ষেপ মাত্র শিক্ষার্থী নিতে পারে। তাই চরম/অন্তিম উদ্দেশ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাকে কোন সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ করে না। **তাই শিক্ষণ ও নিবিড় শিক্ষণ শিক্ষার অঙ্গমাত্র।**

শিক্ষকের সামনে বড় প্রশ্ন কী পড়াবেন, কেন পড়াবেন, পাঠক্রমের কোনো একটি বিষয় কীভাবে পড়াবেন, কীভাবে তিনি জানতে পারবেন যে শিক্ষার্থী কতটা শিখতে পেরেছে। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য শিক্ষককে কিছু তাৎক্ষণিক লক্ষ্য স্থির করে নিতে হয় যা তাকে পঠনপাঠনের পরিচালনার ক্ষেত্রে পথ দেখাবে। সহজ কথা এই হল, শিক্ষার লক্ষ্য (Educational Objectives)। শিক্ষার লক্ষ্যের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে—

শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য অর্জনের পথে কোনো একটি বিশেষ ক্ষুদ্রতর পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ শেষে কী আচরণ করতে পারবে সে সম্বন্ধে অর্থাৎ তাদের সম্ভাব্য আচরণ পরিবর্তন সম্বন্ধে একটি প্রান্তিক আগাম ধারণা। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য (Educational Objectives) হচ্ছে শিক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য অর্জনের ধাপ বা পদক্ষেপ। আমরা জানি সাধারণভাবে পাঠক্রম বা শিক্ষক পরিকল্পিতভাবে শিক্ষার্থীকে পরপর বিভিন্ন বিষয় ও অভিজ্ঞতা উপস্থাপনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। তাই পাঠক্রম প্রস্তুতির সময় বা শিক্ষক তার পঠনপাঠন কার্য পরিচালনার সময় শিক্ষার্থীর মধ্যে কী আচরণ বা পরিবর্তন আশা করেন সে সম্বন্ধে অগ্রিম ধারণা থাকা প্রয়োজন। আর পাঠক্রম ও শিক্ষণের ফলে শিক্ষার্থীর আচরণে যে পরিবর্তন ঘটবে বা যে প্রগতি ঘটবে সেই প্রত্যাশিত অন্তিম ফলই হল শিক্ষার লক্ষ্য।

শিখনের ওপর শিক্ষার্থীর আচরণে প্রত্যাশিত যে পরিবর্তন ঘটবে বা আচরণের যে প্রগতি ঘটবে সেই প্রত্যাশিত আচরণের পরিবর্তন তিনপ্রকার হতে পারে—মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও দৈহিক প্রতিক্রিয়া বা সঞ্চালনমূলক।

৯.৪.২ শিক্ষার লক্ষ্য ও তার শ্রেণিবিভাগ (Educational Objectives and its Classification)

শিক্ষাক্ষেত্রে লক্ষ্যের শ্রেণিবিভাজন নিয়ে প্রথম প্রয়াস শুরু করেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. বেঞ্জামিন ব্লুম (Dr. Benjamin Bloom)। তিনি পঠনপাঠনের মধ্যে শিক্ষার্থীর মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সঞ্চালনমূলক আচরণের পরিবর্তনের ভিত্তিতে শিক্ষার লক্ষ্য তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করেন।

এই তিনটি শ্রেণিকে তিনি এক একটি বর্গ বলে আখ্যা দেন। সেগুলি হল ঃ

(ক) জ্ঞানবর্গ (Cognitive domain)

(খ) প্রক্ষোভ বর্গ (Affective domain)

(গ) সঞ্চালন বর্গ (Psycho-motor domain)

পরবর্তী স্তরে এদের নিয়ে আলোচনা করা হল।

৯.৪.৩ জ্ঞানবর্গের লক্ষ্য সমূহ (Objectives Under Cognitive Domain)

জ্ঞানবর্গের অধীনে যে সমস্ত শিক্ষার লক্ষ্যের উল্লেখ আছে তাতে চিন্তন, আগমন, সমস্যার সমাধান ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়ার শ্রেণি বিন্যাস আছে। এক কথায় স্মৃতি ও বুদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়বস্তু এই বর্গের অন্তর্গত। ছয়টি প্রধান শ্রেণির লক্ষ্য এই বর্গের অন্তর্গত। এই ছয়টি লক্ষ্য সহজ থেকে জটিল এই ধরনের বিষয়বস্তু দ্বারা ক্রমোচ্চ শ্রেণিতে বিন্যাস করা থাকে। ছয়টি লক্ষ্য হল—

(১) **অবগতি** (Knowledge) ঃ সংজ্ঞা, ঘটনা, নিয়ম, নীতি, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, সময়কাল ইত্যাদি নানান্ বিষয় স্মৃতিতে সংরক্ষণ করাকে বলা হয় অবগতি। অবগমন বোধ অর্থাৎ অবগত হওয়ার প্রক্রিয়া হল জ্ঞানমূলক লক্ষ্যের নিম্নতম স্তর। অবগমনের সর্বোচ্চ স্তর হল, বিষয়বস্তুর সার্বিকতা ও বিমূর্ত অবগমন। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমস্ত পাঠে উপযুক্ত বিষয়ের সমাহার ও বিন্যাস করা হয়।

(২) **বোধ** (Comprehension) ঃ স্মৃতিতে সঞ্চিত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবধারণ না হলে, শিক্ষার্থী অন্তর্নিহিত তথ্য ও তাৎপর্য বুঝতে না পারলে স্মৃতিতে জ্ঞানের সঞ্চয়ের ফলাফল বৃথা হয়। কোনো বিষয়ের ভাবার্থ করা, বাক্যরচনা করা, অনুবাদ করা ইত্যাদি সবই শিক্ষার্থীর 'বোধ' শক্তির পরিচয়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে পাঠক্রম প্রস্তুত করতে হবে।

(৩) **প্রয়োগ** (Application) ঃ এই স্তরে পূর্ব পাঠে অর্জিত বা অধীত নিয়মনীতি, কার্যক্রম বা সাধারণ তত্ত্ব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে কতটা কাজে লাগাতে পারে তা জানার জন্য বিষয়বস্তু ও অভিজ্ঞতা পাঠক্রমে যুক্ত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ প্রাথমিক স্তরে যোগ-বিয়োগ করার অভিজ্ঞতা কীভাবে শিক্ষার্থী বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কাজে লাগাতে পারে তা জানার জন্য এই স্তরে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অথবা শিক্ষণের বিভিন্ন সূত্র শিক্ষার্থীর পঠনপাঠন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা যাবে তা জানা শিক্ষার্থীর কাছ থেকে। অথবা ক্ষেত্রফল শিখে খেলার মাঠ মাপা ইত্যাদি।

(৪) **বিশ্লেষণ** (Analysis) ঃ শিক্ষার এই উচ্চতর লক্ষ্য পূর্ববর্তী লক্ষ্যগুলি অর্জনের মধ্যে দিয়ে পূরণ করা হয়। পাঠক্রমে সরল তথ্য যেমন থাকে তেমনি ক্রমশ জটিলতার ধারণা ধাপে ধাপে শিক্ষাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। জটিল ধারণার অবধারণের জন্য বিশ্লেষণ অপরিহার্য। সহজ কথায় পাঠক্রম রচনা করার সময় সরল থেকে জটিল ধারণার যে নীতির কথা বলা হয়েছে তা শিক্ষার বিশ্লেষণাত্মক লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যেই।

(৫) **সংশ্লেষণ** (Synthesis) ঃ বিশ্লেষণের বিপরীত প্রক্রিয়া হল সংশ্লেষণ। কোনো ধারণার উপাদানগুলিকে একত্র করে একটি ধারণার সংহত ও সংগঠিত রূপ দেওয়া হল সংশ্লেষণ। প্রাথমিক পর্বে ভাবার্থ লেখা, রচনা ইত্যাদি এই লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো গবেষণার ছক নির্মাণ এই লক্ষ্যের আওতায় পড়ে।

(৬) **মূল্যায়ন** (Evaluation) ঃ জ্ঞানমূলক লক্ষ্যের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে মূল্যায়ন। কোনো ধারণা, যুক্তি, পরিকল্পনা, কোনো বিষয়ের যথার্থতা, গুণাগুণ ইত্যাদি বিষয়ে বিচার করার প্রক্রিয়া এই ধরনের বিষয়বস্তু বা অভিজ্ঞতা দ্বারা পাঠক্রমে যুক্ত করা হয়। শিক্ষার লক্ষ্যের ক্ষেত্রে এই যথার্থতা বিচার করা সবচেয়ে উন্নত পর্বের জ্ঞান আহরণ স্তর। এই জন্য পাঠক্রমে এমন অভিজ্ঞতা ও কার্যপ্রণালী অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাতে শিক্ষার্থী কোনো তত্ত্ব বা তথ্য নির্বিচারে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। পাঠক্রমে কোনো কবিতা মুখস্থ করার কাজ হল অবগতি, তার অর্থ ব্যাখ্যা করা হল বোধ, একইরকম বা একইভাবের অন্য কবিতাকে চিহ্নিত করা হল প্রয়োগ, কবিতাটির শব্দ, ছন্দ, যতি ইত্যাদি ভাগ করার কাজ হল বিশ্লেষণ, কবিতার সৌন্দর্য বিচার করার কাজ হল মূল্যায়ন।

শিক্ষার জ্ঞানমূলক লক্ষ্যগুলি পরীক্ষার মাধ্যমে বা আদর্শগত নানান অভিজ্ঞতার মধ্যে মাপা যায়।

৯.৪.৪ প্রাক্ষোভিক বা অনুভবমূলক লক্ষ্য (Affective Domain)

শিক্ষার্থীর অনুভব, আবেগ, মূল্যবোধ (Values), প্রতিন্যাস (attitude) ইত্যাদি সঠিকভাবে বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটানো শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। ১৯৬৪ সালে ক্র্যাথওয়েল (Krathwohl), ব্লুম (Bloom) এবং ম্যাসিয়া যৌথভাবে শিক্ষার প্রাক্ষোভিক বা অনুভব লক্ষ্যের শ্রেণি বিন্যাস করেন। এই লক্ষ্যগুলি জ্ঞানমূলক লক্ষ্যের মতো এত প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ হয় না। শিক্ষণ-শিক্ষা প্রক্রিয়ায় এই অনুভবমূলক লক্ষ্য নেপথ্যে বা পরোক্ষে সূক্ষ্মভাবে কাজ করে যা প্রতিফলিত হয়ে থাকে। যদিও অনুভবমূলক লক্ষ্যগুলি সরাসরি পরীক্ষার ফলাফলে বোঝা যায় না।

অনুভবমূলক লক্ষ্য অর্জিত হয় শিক্ষাথীর অর্জিত জ্ঞানের আত্মীকরণের মাধ্যমে। শিক্ষার ফলে

শিক্ষার্থীর মধ্যে যে স্থায়ী মূল্যবোধের পরিবর্তন আসে, পাঠক্রমে তাই রাখা হয় তারই সহায়ক বিষয় ও অভিজ্ঞতা। প্রক্ষোভমূলক লক্ষ্য মূলত পাঁচ ধরনের। নীচে এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আকারে বলা হল।

(১) **গ্রহণ বা মনোযোগদান** (Receiving or attending) ঃ কোনো উদ্দীপকে উপস্থিতি সম্বন্ধে যে সচেতনা শিক্ষার্থী লাভ করে তাই হল মনোযোগদান। সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগের মাধ্যমে পাঠ্যবস্তু গ্রহণ করা শিক্ষার প্রাথমিক শর্ত। পাঠক্রমে বিষয়বস্তু নির্বাচন ও উপস্থাপনার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে শিক্ষার্থী তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিষয়বস্তু মনোযোগ সহকারে গ্রহণ করতে সচেষ্ট হয়। পাঠ্য বিষয়ে সচেতনতা (Awareness), গ্রহণ মনস্কতা (Willingness to receive) এবং নিয়ন্ত্রিত মনোযোগ এসব ক্ষমতা এই পর্যায়ভুক্ত।

(২) **প্রতিক্রিয়াকরণ** (Responding) ঃ পাঠক্রমে উপাদানগুলি শিক্ষার্থী গ্রহণ করতে সচেষ্ট হলে তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া হবে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও প্রত্যুত্তরদান অথবা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর প্রত্যুত্তর করা/বা প্রত্যুত্তরের ইচ্ছা প্রকাশ করা। তাই পাঠক্রমে সেইসব অভিজ্ঞতাই নেওয়া হবে শিক্ষার্থীকে প্রতিক্রিয়া করতে ও প্রত্যুত্তর দানে আগ্রহী করে তুলতে। আসলে প্রত্যুত্তর দানে সম্মতি, প্রত্যুত্তর দানের ইচ্ছা ও প্রত্যুত্তর দানের সন্তুষ্টি সবই এই অনুভব লক্ষ্যের নির্দেশক হিসেবে কাজ করে।

(৩) **গুরুত্ব আরোপ করা** (Valuing) ঃ প্রতিক্রিয়াকরণ ও উত্তরদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তা তার কাছে মূল্যবান। ফলে বিষয় ও পাঠক্রম তার কাছে গুরুত্বপর্ণ বলে বিবেচিত হবে। বিষয় নির্বাচনের সময় মনে রাখতে হবে যে পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে হবে।

(৪) **সংগঠিতকরণ** (Organization) ঃ পাঠক্রমে শিক্ষণীয় বিষয়ের বিভিন্ন তথ্য, তত্ত্ব বা সূত্র সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর মনে আনুগত্য বা মূল্যবোধ জন্মালে ধীরে ধীরে এগুলি একত্রে সংগঠিত হয়ে ব্যক্তির এক ধরনের নিজস্ব বিচারবোধ জন্মায়। যেমন পরিবেশ সচেতনতা বোধ থেকে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব, জল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সংযুক্ত হয়ে ব্যক্তির মনে পরিবেশ সচেতনতার আকার নেয়। তখন ভালোমন্দ বিচার করা, খুঁটিনাটি সব লক্ষ্য করা ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য জ্ঞানকে সংগঠিত করা, এইসব গুণাগুণ মূল্যবোধের পরম সংগঠনের প্রকাশ বলে মনে করা হয়।

(৫) **গুরুত্ববোধ ও পরম মূল্যবোধের মাধ্যমে চরিত্রায়ন** (Characterisation by a value or value complex) ঃ শিক্ষার অনুভবমূলক লক্ষ্যের চূড়ান্ত পরিণতি হল চরিত্রায়ন। অর্থাৎ যখন পাঠক্রমের জ্ঞান মানুষের জীবনচর্চা ও জীবনাদর্শে অঙ্গীভূত হয়, যেমন—স্বাস্থ্যচর্চার জ্ঞান হিসেবে হাত ধুয়ে খাওয়া। প্রাথমিক স্কুলের পাঠক্রমের বিষয় আমাদের প্রত্যেকের জীবনচর্চায় মিশে যায়। এই পর্যায়ে মানুষের

চরিত্রে একটি সামান্য মানসিক অবস্থা (Generalized set) তৈরি হয়ে যায়। যার ভিত্তি হল, পরমমূল্যবোধের একটি স্থায়ী সংগঠন। শিক্ষার্থীর জীবনে এই সর্বব্যাপ্ত মূল্যবোধ সৃষ্টি হলে, তা তার চরিত্রে অঙ্গীভূত হয়। সুতরাং আদর্শ পাঠক্রমের লক্ষ্য হবে জ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর স্থায়ী চরিত্র গঠন।

৯.৪.৫ সঞ্চালন বর্গের লক্ষ্য (Objectives Under Psycho-motor Domain)

পাঠক্রমের সঞ্চালনমূলক লক্ষ্যের শ্রেণি বিভাজন করেন এলিজাবেথ সিম্পসন (Elizabeth Simpson)। ১৯৭২ সালে জ্ঞানমূলক ও অনুভবমূলক লক্ষ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে যতটা গুরুত্বপূর্ণ সঞ্চালনমূলক শিখনও ততটা গুরুত্বপূর্ণ। সঞ্চালনমূলক শিখন (Psychomotor learning) কথাটির অর্থ হল শরীরের পেশিগুলির সুসামঞ্জস্য ও উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন করার দক্ষতা অর্জন। নীচে সঞ্চালনমূলক লক্ষ্যের শ্রেণি বিভাজন নিয়ে আলোচনা করা হল ঃ

(১) **প্রত্যক্ষণ** (Perception) ঃ পাঠক্রমে বিষয়বস্তু এমনভাবে নির্বাচন করা হয় যাতে করে সকল ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা গ্রহণে প্রস্থ ও সক্রিয়তাতে সাহায্য করতে পারে। অর্থাৎ পাঠক্রমে অন্তর্গত বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়া অত্যন্ত জরুরি। প্রত্যক্ষণ সঞ্চালন বর্গের প্রথম স্তর।

(২) **প্রস্তুতি** (Set) ঃ সঞ্চালনমূলক লক্ষ্যের দ্বিতীয় স্তর হল প্রস্তুতি। অর্থাৎ ক্রিয়া সম্পাদনে শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করে তোলা। তাই প্রস্তুতি তিনপ্রকার যেমন—মানসিক, শারীরিক, ও প্রাক্ষোভিক হতে পারে। অর্থাৎ কোনো কাজ সম্পাদন করার জন্য পদ্ধতিকে জানা, তা সঠিকভাবে করা ও সেই সফলতা অনুভব করা।

(৩) **নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়া** (Guided responses) ঃ পাঠক্রমে এমন নির্দেশ থাকা আবশ্যক যাতে শিক্ষার্থীকে কোনো অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে কী ধরনের সক্রিয়তা প্রয়োজন তা উদাহরণস্বরূপ পাঠক্রমে উপস্থাপিত করা। অর্থাৎ শিক্ষক বৃত্ত এঁকে দেখালে ছাত্র তা করতে পারবে।

(৪) **জটিল সক্রিয়তা** (Complex overt responses) ঃ কোনো কৌশল আয়ত্ত হলে শিক্ষার্থী স্বেচ্ছায় তা দক্ষতার সঙ্গে অনুরূপভাবে সম্পাদন করতে পারলে তাকে জটিল সক্রিয়তা বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে পাঠক্রমে এই জটিল সক্রিয়তার বিষয়টি অভিজ্ঞতা হিসেবে পরিগণিত হয়। যেমন কম্পিউটারে key Board ও Mouse-এর ব্যবহার জেনে কোনো কিছু সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা।

(৫) **অভিযোজন** (Adaptation) ঃ কোনো সঞ্চালন কৌশল পাঠক্রমে আয়ত্ত হলে তাকে অনুরূপ ক্ষেত্রে বা বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারাকে অভিযোজন বলা হয়। সাধারণ উল বোনার সময়

'সোজা ও 'উলটো' এই দুই ধরনের ডিজাইন থেকে সোয়েটারে নানা নক্শা প্রস্তুত করা।

(৬) সৃজন (Origination) ঃ অভিযোজন আয়ত্ত হলে সঞ্চালনমূলক লক্ষ্যের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানো সম্ভব। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী পূর্বে শেখা একাধিক কৌশলের সমন্বয় ঘটিয়ে নতুন কিছু তৈরি করবে। যেমন পিয়ানোর বিভিন্ন রাগ বাজানো শিখে এদের নিয়ে নতুন কোনো সুর সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

পাঠক্রম প্রস্তুতির ক্ষেত্রে শিক্ষার লক্ষ্যের শ্রেণি বিন্যাসের গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রেণি বিন্যাসের মাধ্যমে শিক্ষক যেমন জানেন তিনি কী পড়াবেন, কেমনভাবে পড়াবেন আবার পড়ুয়াও বুঝতে পারে পাঠমালা শেষে তার কী জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন হবে। তা ছাড়া পাঠক্রমের মূল্যায়নেও এর গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অনেক।

৯.৫ পাঠক্রম রচনা এবং সিস্টেম পদ্ধতি (Curriculum Development Process and System Approach)

৯.৫.১ সিস্টেম পদ্ধতির ধারণাগত ভিত্তি (Concept About System Approach)

পাঠক্রম একটি গতিশীল ও নিরন্তর প্রক্রিয়া। পাঠক্রম রচনার সময় যেমন তাত্ত্বিকজ্ঞানের প্রয়োজন তেমনি দরকার বাস্তব উপযোগিতা, সম্ভাব্য পরিস্থিতি, প্রয়োজনীয় উপাদান ও সম্পদ সম্বন্ধে বাস্তবসম্মত ধারণা। দেখা গেছে বেশিরভাগ সময়ে পাঠক্রম রচনার সময় বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন ও চাহিদা/পরিস্থিতিভিত্তিক তথ্যের ঘাটতি থাকায় অনেক ক্ষেত্রে পাঠক্রম শিক্ষার্থীর জীবন বা জীবিকা অথবা সমাজের চাহিদাভিত্তিক হতে পারে না। অর্থাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাঠক্রম ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে। পাঠক্রম প্রস্তুতির ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা দূর করার উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছে পাঠক্রমের সিস্টেম পদ্ধতি। পাঠক্রমে সিস্টেম পদ্ধতি হচ্ছে একগুচ্ছ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত উপাদান ও পরিস্থিতি, যারা সম্মিলিতভাবে কোনো কাজকে সম্পূর্ণতা দান করে। ব্যাঙ্গার্ভ (1969)-এর মতে সিস্টেম হতে পারে একটি সুসংগঠিত পারস্পরিক ক্রিয়াশীল উপাদান সমূহের সমষ্টি যা সহযোগিতার ভিত্তিতে পূর্ব নির্দিষ্ট কাজ করে। এ. কে. জালালউদ্দিন সিস্টেমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন সিস্টেম হল একটি গতিশীল জটিল সামগ্রিক একক যা পাঠক্রমের পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত স্বাধীন উপাদানসমূহকে পূর্বনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনে সুসংগঠিত করে আরও কার্যকরী রূপ দিতে সাহায্য করে। এই ধারণা অনুযায়ী সিস্টেম পদ্ধতিতে তিনটি মুখ্য বিষয় বেছে নিতে হয়। এগুলি হল—

(১) যে-কোনো সিস্টেমে কতগুলি অংশ রয়েছে। এই অংশগুলি পরস্পরের সঙ্গো সম্পর্ক যুক্ত। এরা পাঠক্রমে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ না করে সম্মিলিতভাবে কাজ করে।

(২) পাঠক্রম যেহেতু কোনো কাজ/লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে তাই সিস্টেমের প্রতিটি অংশের লক্ষ্য ও গতিপথ সে কাজের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট ও ক্রিয়াশীল হবে।

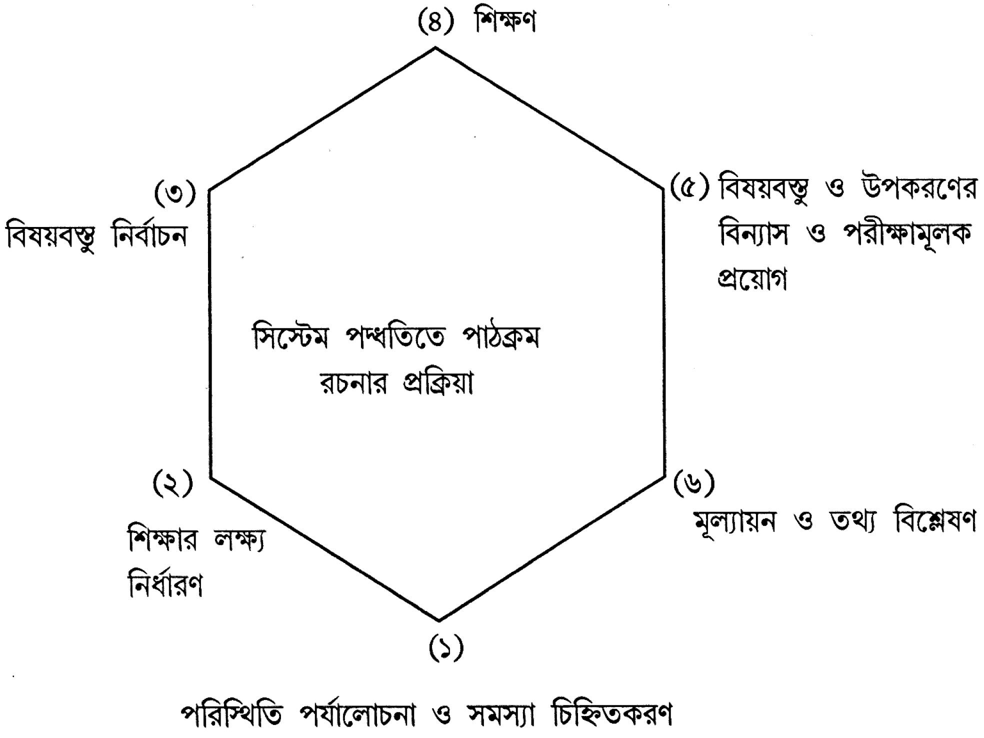

চিত্র ৯.২ সিস্টেম পদ্ধতিতে পাঠক্রম রচনার প্রক্রিয়া।

(৩) প্রতিটি সিস্টেম কোনো একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্রিয়াশীল থাকে তাই সেই পরিবেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে সিস্টেমের বিভিন্ন অংশের কার্যপ্রণালী ও সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন, মানবদেহে যে পরিপাক সিস্টেম রয়েছে যার কোনো একটি সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তা দেহের পুষ্টি ও পরিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। তেমনি সিস্টেম পদ্ধতি অনুযায়ী পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষার লক্ষ্য, পরিবেশ ও চাহিদার সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত উপাদান, শিক্ষণ পদ্ধতি, মূল্যায়ন, নিরন্তর মূল্যায়নভিত্তিক পাঠক্রমের পরিমার্জনা, পরিবর্ধন ইত্যাদি অনেকগুলি অংশের সমন্বয়ে একটি সিস্টেম নির্মিত হয়।

(৪) পাঠক্রমে সিস্টেম অনুযায়ী বিভিন্ন অংশ পরিবর্তনশীল, নমনীয় এবং গতিশীল হয়ে শিক্ষার মূল লক্ষ্যে উপনীত হবার চেষ্টা করে।

৯.২ চিত্রে পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে সিস্টেমের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে ছক আকারে দেখানো হল।

৯.৫.২ সিস্টেম পদ্ধতিতে পাঠক্রম রচনার পর্যায়ক্রম (Steps of Curriculum Development in System Approach)

সিস্টেম পদ্ধতির সময়ে বিভিন্ন বিষয় ও উপাদান কীভাবে কাজ করে থাকে তা পর্যায়ক্রমে নীচে দেখানো হল ঃ

পর্যায়-১ ঃ পরিস্থিতি ও চাহিদা বিশ্লেষণ ঃ পাঠ্যক্রমের গ্রহণযোগ্যতা ও উপযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পাঠক্রম সমাজের চাহিদা ও শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী প্রস্তুত হওয়ার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। এই চাহিদার বিচার হবে বর্তমান ও ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তাই পাঠক্রম রচনার সময় প্রথম কাজ হল চাহিদার বিশ্লেষণ। আর কোন্ কোন্ চাহিদা পাঠক্রমে স্থান পাওয়ার যোগ্য তা স্থির করা এবং চাহিদার সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির গুরুত্ব নির্ণয় করা।

পর্যায়-২ ঃ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ ঃ এই পর্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এখানে পাঠক্রম রচয়িতাদের পাঠক্রমের চাহিদা ও বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণের সঙ্গে সংগতি রেখে শিক্ষার তাৎক্ষণিক ও চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ণয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এই পর্যায়ে পাঠক্রম রচনার নীতি যেমন স্থির হয় তেমনি চাহিদা, পরিস্থিতি ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে পাঠক্রমের কাঠামোও স্থির করা হয় এই দ্বিতীয় পর্যায়ে।

পর্যায়-৩ ঃ বিষয়বস্তু নির্বাচন ঃ এই পর্যায়ে পাঠক্রমের খুঁটিনাটিসহ খসড়া রচনা করা হয়। একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে বিষয়বস্তু নির্বাচন করার অর্থ এই নয় যে কয়েকটি পাঠ্য বিষয়কে নিছক তালিকাভুক্ত করা শিক্ষার মূল লক্ষ্য, তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়, কার্যক্রম ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদি যুক্ত করার তালিকা প্রস্তুত হয় এই পর্যায়ে।

পর্যায়-৪ ঃ শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন ঃ ৩য় পর্যায়ে তৈরি করা খসড়া শিক্ষণের পদ্ধতি, সময়কাল, কৌশল ও উপকরণের বিচারে এখানে পরিমার্জন করা হয়। তা ছাড়া পঠনপাঠনের সময় কী কী বিষয় অন্তরায় হতে পারে সেই অনুযায়ী কী কী পরিবর্তন করা দরকার তা বিচার করে খসড়াটি আরও উন্নতমানের করার চেষ্টা হয়।

পর্যায়-৫ ঃ বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও পরীক্ষামূলক প্রয়োগ ঃ আদর্শ সিস্টেম পদ্ধতিতে পাঠক্রমটি পরীক্ষামূলকভাবে শিক্ষার্থীদের ওপর প্রয়োগ করার কাজ করা হয়। এই পর্যায়ে তাই বিষয়বস্তু নানান বিকল্প বিন্যাসের মধ্যে কোন্‌টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্যতা বেশি তা স্থির করা হয়।

পর্যায়-৬ ঃ মূল্যায়ন ও তথ্য বিশ্লেষণ ঃ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও নানা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মূল্যায়ন ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই স্তরে বিষয়বস্তুর পরিমার্জনা, সংশোধন ও পরিবর্ধন করা এই পর্যায়ে শুরু হয়। প্রাপ্ত সংস্কার ও পরিমার্জনার পর প্রথম পর্যায়ে আবার ফিরে যাওয়া হয়।

৯.৬ উপসংহার (Conclusion)

এই অধ্যায়ে পাঠক্রম রচনার রীতিনীতির সঙ্গো সঙ্গো বাস্তব পরিস্থিতির ভারসাম্য রেখে পাঠক্রম রচনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হল। সাধারণভাবে পাঠক্রমের লক্ষ্য সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও শিখনের নানা তত্ত্বের সঙ্গো সংমিশ্রণ করে গড়ে উঠেছে পাঠক্রমের বিষয় বিন্যাসের নীতি ও বিষয় নির্বাচনের নীতি। **বিষয় নির্বাচনের** ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে শিশুকেন্দ্রিকতা, সমাজকেন্দ্রিকতা, সৃজনশীলতা, সমাজের সংরক্ষণতা ও অগ্রমামিতা ইত্যাদি দিক, তেমনি বিষয় বিন্যাসের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ের বা সমাহারের সঙ্গো তাদের সক্রিয়তা ও নমনীয়তার দিকে অর্থাৎ ক্রিয়াশীলতা। তা ছাড়া পাঠক্রমে বিষয় নির্বাচন করার সময় শিক্ষার লক্ষ্যের শ্রেণিবিভাজন—জ্ঞানবর্গ, প্রক্ষোভবর্গ ও সঞ্চালন বর্গের শ্রেণি বিন্যাসের মাধ্যমে শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে পঠনপাঠনের বিষয় নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন। পাঠক্রম রচনা করা একটি দীর্ঘকালীন ও দলবন্ধ কাজ। তাই সিস্টেম পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠক্রমে বিষয়বস্তু নির্বাচন, পদ্ধতি ও উপকরণ ঠিক করা, মূল্যায়ন ও তথ্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

৯.৭ প্রশ্নাবলি (Questions)

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay type Questions)

১। পাঠক্রম রচনার মূল নীতিগুলি আলোচনা করুন।

২। পাঠক্রম বলতে কী বোঝায়? পাঠক্রমে উপাদান নির্বাচনের মূলনীতিগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৩। শিক্ষার লক্ষ্যের শ্রেণি বিভাজন বলতে কী বোঝায়? এই শ্রেণি বিভাজন মূলত কারা উপস্থাপিত করেছেন? সংক্ষেপে শিক্ষার লক্ষ্যের শ্রেণি বিভাজন নিয়ে আলোচনা করুন।

৪। জ্ঞানবর্গ ও প্রক্ষোভ বর্গ অনুযায়ী শিক্ষা লক্ষ্যের শ্রেণি বিভাজন নিয়ে আলোচনা করুন।

৫। শিক্ষার লক্ষ্যের প্রক্ষোভ বর্গ ও সঞ্চালন বর্গের শ্রেণি বিভাজন বলতে কী বোঝায়? এই দুই লক্ষ্যের শ্রেণি বিভাজন বিবৃত করুন। এদের উপযোগিতা উল্লেখ করুন।

৬। পাঠক্রম প্রস্তুতির জন্য যে যে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তা সবিস্তারে আলোচনা করুন।

৭। সিস্টেম পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়? সিস্টেম পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন। সিস্টেম পদ্ধতিতে পাঠক্রম রচনার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৮। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Questions)

(ক) পাঠক্রমে উপাদান নির্বাচনের নীতি।

(খ) জ্ঞানবর্গের শ্রেণি বিন্যাস।

(গ) পাঠক্রম ও প্রক্ষোভ বর্গের লক্ষ্য।

(ঘ) পাঠক্রমে উপাদানের বিন্যাসনীতি।

(ঙ) সিস্টেম পদ্ধতিতে পাঠক্রম রচনা।

একক ১০ ☐ পাঠক্রমের মূল্যায়ন (Evaluation of Curriculam)

গঠন

১০.১ সূচনা

১০.২ উদ্দেশ্য

১০.৩ পাঠক্রমের মূল্যায়নের ধারণা

১০.৪ পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের প্রকার ভেদ

১০.৪.১ ক্রমিক মূল্যায়নের ধারণা

১০.৪.২ ক্রমিক মূল্যায়নের ধাপ

১০.৪.৩ ক্রমিক মূল্যায়নের গুরুত্ব

১০.৪.৪ ক্রমিক মূল্যায়নের অসুবিধা

১০.৪.৫ অন্তিম মূল্যায়ন কী

১০.৪.৬ অন্তিম মূল্যায়নের সুবিধা

১০.৪.৭ অন্তিম মূল্যায়নের অসুবিধে

১০.৫ উপসংহার

১০.৬ প্রশ্নাবলি

১০.১ সূচনা (Introduction)

পাঠক্রম হল একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। এই পরিকল্পনার ছক অনুযায়ী শিক্ষার সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। সুতরাং পাঠক্রমের গুণমান ও শিক্ষার গুণমান সমার্থক। তাই পাঠক্রমের মূল্যপত্র হওয়া প্রয়োজন।

পাঠক্রম রচনার কাজটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তাই তার মূল্যায়ন কখন হবে? প্রয়োগের আগে না পরে? এই নিয়ে নানা মতবাদ আছে। এর উত্তরে বলা প্রয়োজন উভয় পর্যায়েই হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে দু রকম মূল্যায়নের কথা বলা হয়ে থাকে। এগুলো হল—(১) ক্রমিক মূল্যায়ন ও (২) অন্তিম মূল্যায়ন। এই অধ্যায়ে পাঠক্রমের এইসব মূল্যায়নের ছবি তুলে ধরা হয়েছে।

১০.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে, শিক্ষার্থীরা—

- পাঠক্রমের মূল্যায়নের ধারণা ব্যাখা করতে পারবেন।
- পাঠক্রম মূল্যায়নের প্রকারভেদ—ক্রমিক মূল্যায়ন ও অন্তিম মূল্যায়ন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন এবং প্রয়োগ করতে পারবেন।

১০.৩ পাঠক্রমের মূল্যায়নের ধারণা (Concept of Evaluation of Curriculum)

পাঠক্রমের মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এর উদ্দেশ্য হল পাঠক্রমের উদ্দেশ্য ও প্রতিটি পর্যায়ের গুণমান নির্ণয় করা। মূল্যায়নের ভিত্তিতে সামগ্রিকভাবে পাঠক্রমের পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু পদ্ধতি ও শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের বিভিন্ন দিকে ভাল-মন্দ, গুণাগুণ, সাফল্য ও ব্যর্থতা জানা যাবে এবং সেই অনুযায়ী পরিমার্জনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

মূল্যায়ন শব্দের অর্থ একটি নির্দিষ্ট বা নিরূপিত গুণমানের পরিপ্রেক্ষিতে সম-চরিত্রের অপর একটি বস্তু বা ব্যক্তির গুণমানের মূল্য নির্ধারণ (পরিমাপের ভিত্তিতে)। তাই মূল্যায়নকে জানতে হলে মূল্যায়নের সাথে পরিমাপের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য জানা প্রয়োজন। কারণ এরা দুজনেই পাঠক্রমের গুণমান নির্ণয়ে ওতপ্রতো ভাবে জড়িত থাকে।

আন্তর্জাতিক শিক্ষা অভিধানে (১৯৭৭) মূল্যায়ন প্রসঙ্গো বলা হয়েছে পর্যাবেক্ষণের ভিত্তিতে মূল্য বিচার করা। পাঠক্রমের মূল্যায়ন বলতে বোঝায় ধারাবাহিক ভাবে গুণগত (qualitative) ও পরিমাণগত (quantitative) তথ্য সংগ্রহ করে ও তার বিশ্লেষণ করে পাঠক্রমের সম্বন্ধে পরিবর্তনশীল ও নমনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনশীল কারণ সংগৃহীত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রমের একটি পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ের পরিবর্তনের মান ও দিক্ নির্দেশিত হতে পারে। আর এই সিদ্ধান্তের জন্য যে পরিমাণগত তথ্যের প্রয়োজন তার উৎস হল পরিমাপ।

সাধারণভাবে মূল্যায়ন হল একটি সামগ্রিক ধারণা আর পরিমাপ হচ্ছে একটি আংশিক ধারণা অর্থাৎ তার উপর কোন অভীক্ষা প্রয়োগ করে পাঠক্রমের পর শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাণ মাপ করা। কিন্তু মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাঠক্রমের সমস্ত বৈশিষ্ট্য—যেমন লক্ষ্য, বিষয়, পদ্ধতি ও ছাত্রের অর্জিত জ্ঞানের পরিমাণ ইত্যাদি সবই জানা যায়।

১০.৪ পাঠক্রমে মূল্যায়নের প্রকারভেদ (Types of Curriculum Evaluation)

পাঠক্রম রচনা ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন দু রকমের হয়ে থাকে—(১) ক্রমিক মূল্যায়ন এবং (২) অন্তিম মূল্যায়ন।

১০.৪.১ ক্রমিক মূল্যায়নের ধারণা (Concept of Formative Evaluation)

কোন পাঠক্রমের পরিকল্পনা ও তা রূপায়ণের নানা পর্যায়ে পাঠক্রমকে উন্নত ও ত্রুটি মুক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের জন্য ধারাবাহিক বা ক্রমিক মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। আসলে যখন শিক্ষা প্রক্রিয়া চলাকালীন প্রতিটি পর্যায়ে পাঠক্রমের গুণমান বিচার করার মধ্য দিয়ে উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা করা হয় তখনই থাকে, ফলে formative evaluation বা ক্রমিক মূল্যায়ন। পাঠক্রম নির্মাণ (formation) হবার সময় স্তরে স্তরে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলে। আর ক্রমিক মূল্যায়ন কথাটির অর্থ হল পাঠক্রম প্রস্তুতির প্রত্যেক ধাপে গুণমান বিচার করা।

এই প্রক্রিয়া বুঝতে পাঠক্রম রচনার প্রত্যেকটি ধাপের কথা মাথায় রেখে মূল্যায়নের লক্ষ্য স্থির করা হয়। প্রতিটি ধাপ বা পর্যায় অনুযায়ী মূল্যায়নের লক্ষ্য ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়। নীচে তা আলোচনা করা গেল।

১০.৪.২ ক্রমিক মূল্যায়নের ধাপ ঃ

প্রথম ধাপ ঃ এই ধাপে মূল্যায়নের লক্ষ্য হচ্ছে পাঠক্রমের যে ভিত্তি স্থির কথা হয়ে তা যথার্থ কি-না ? এই পর্যায়ে মূল্যায়ন করার সময় মনে রাখতে হবে পড়ুয়াদের শারীরিক ও মানসিক স্তর কেমন ? পড়ুয়া যে স্তরে আছে সেখানে সামাজিক না শারীরিক কোন ধরনের বিকাশে গুরুত্ব দেওয়া হবে ? কোন মতবাদের ভিত্তি অর্থাৎ পাঠক্রমের দার্শনিক, ভিত্তি হিসেবে ভাববাদ, প্রয়োগবাদ বা প্রকৃতিবাদের কি সে গুরুত্ব হবে ? পাঠক্রমে জ্ঞান, আবেগ ইত্যাদি কোন বিষয়ে অধিক জোর দেওয়া হবে ইত্যাদি। অর্থাৎ পাঠক্রমের নানা ভিত্তির গুণাগুণ বিচার এই স্তরের মূল্যায়নের প্রধান লক্ষ্য।

দ্বিতীয় ধাপ ঃ প্রথম স্তরের মূল্যায়নে প্রাপ্ত ভিত্তি সমূহের মধ্যে যেগুলি গুণমানে সঠিক বিবেচিত হয় সেগুলির দ্বিতীয় স্তরের মূল্যায়ন পর্ব চলে।

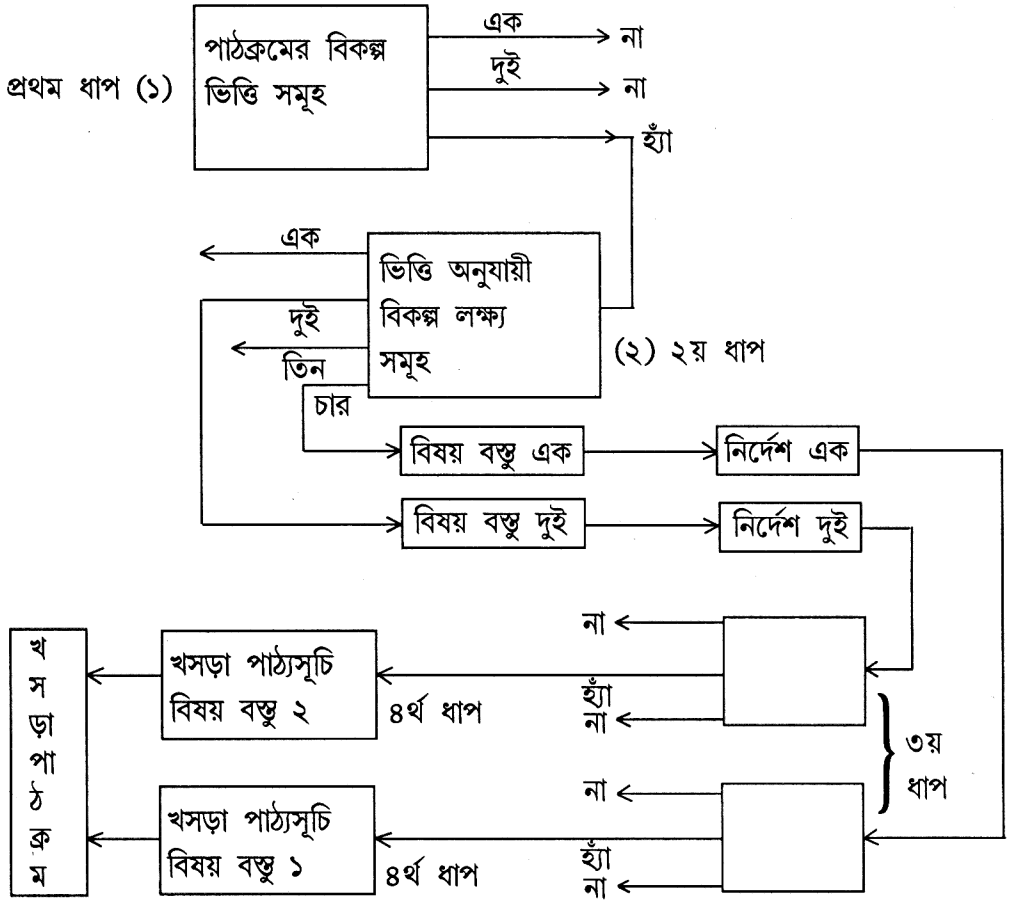

ছক ১০.১ ঃ ছকের সাহায্যে ক্রমিক মূল্যায়নের ধাপ দেখানো হল—

প্রথম ধাপের মূল্যায়নের মাধ্যমে বিবেচিত ভিত্তিগুলিকে নিয়ে মূল্যায়ন এখানে হয়। প্রথম স্তরের ধারণার উপর ভিত্তি করে পাঠক্রমের বৃহত্তর ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য গুলি স্থির করা হয়। বিকল্প ভিত্তিগুলির মধ্যে যেগুলি সঠিক গুরুত্বপূর্ণ সেই অনুযায়ী পাঠক্রমের নানান বিকল্প লক্ষ্য গুলিকে দেখা হয়। এই স্তরের চিহ্নিত ৪/৫টি লক্ষ্যের মধ্যে কোনটি বেশি গুরুত্ব পূর্ণ সেগুলি মূল্যায়নের ভিত্তিতে চিহ্নিত করে পরবর্তী স্তরে বিষয় নির্ধারণের জন্য বেঁছে নেওয়া হয়।

তৃতীয় ধাপ ঃ পূর্ববর্তী ধাপে চিহ্নিত লক্ষ্য অনুযায়ী কি ধরনের বিষয়বস্তু নির্ধারণ হবে তা আগে জেনে নিতে হবে। আর দেখতে হবে পড়ুয়া ও সময়কাল অনুযায়ী তার উপযোগিতা কতটা ? তারই

ভিত্তিতে এই পর্যায়ে বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন হয় এবং নির্দেশদানের জন্য কতটা যুক্তিযুক্ত তা বিচার করা হয়।

চতুর্থ পাঠ ঃ পাঠক্রমে প্রয়োগের জন্য নির্দেশদান কর্মসূচি মূলত বিষয়বস্তু নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল। যদি পূর্বোক্তস্তরে প্রথাগত ইতিহাস পাঠে গুরুত্ব দেওয়া হয় তবে তারই সহায়ক বিষয়বস্তু—পঠন পাঠনে গুরুত্ব পাবে। আর যদি ইতিহাস পাঠের সাথে অঙ্কের বিষয়ের গুরুত্ব দেবার কথা পূর্ববর্তী স্তরে গুণমানের বিচারে উল্লেখিত হয়, তা হলে তাও এই স্তরে নির্দেশ ও বিন্যাসের জন্য গুরুত্ব পাবে। ক্রমিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে এইসব নির্দেশ এর কার্যকারিতা প্রয়োজনীয়তা পরিবর্তন ও সংশোধন করা যেতে পারে।

পঞ্চম ধাপ ঃ একটি বৃহত্তর বিষয় যেমন—অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি নির্বাচিত হবার পর বিষয় বস্তুর বিন্যাস একটি গুরত্ব পূর্ণ কাজ। এই বিষয়গুলি বিন্যাস করার পর সার্বজনীন বলে মনে হবে ; সেক্ষেত্রেও অনেক সময় পুনর্বিচার করা প্রয়োজন বলে মনে হতে পারে। এই স্তরে অনেক গুলি সম্ভাব্য বিন্যাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপযোগী কোনগুলি তা মূল্যায়নের মাধ্যমে এই স্তরে ঠিক হয়। তার পর খসড়া পাঠক্রম প্রস্তুত হয়।

১০.১ ছকে এই স্তর গুলি দেখানো হয়েছে।

ক্রমিক মূল্যায়ন এখানেই শেষ নয়। এই মূল্যায়নের সময় পরিকাঠামো ও শিক্ষকের যোগ্যতা বিচার্য।

পরিকাঠামো ঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠক্রমের প্রয়োজনে কিছু কিছু পরিকাঠামো গড়ে ওঠে। যেমন বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য চাই উপযুক্ত পরীক্ষাগার। তাই পাঠক্রম প্রস্তুতির সময় দেখে নিতে হয় পাঠক্রমের সহায়ক পরিকাঠামো ও সম্পদ আছে কিনা। যদি পাঠক্রমটি কম্পিউটার ভিত্তিক হয়, তা হলে তার বিদ্যালয়ে কম্পিউটার আছে-কি-না বা তা সংগৃহীত হতে পারে কি-না এই বিষয়টি বিচার্য। মূল্যায়নের সময় বিদ্যালয়ের অবস্থান, স্থান, পরীক্ষাগার, পাঠাগার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সকল বিষয়ের মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষক ঃ পাঠক্রম রচনা মুলত শিক্ষকরাই করেন। কিন্তু সমস্ত শিক্ষককে এই কাজে সামিল করা সম্ভব নয়। তবে পাঠক্রমের কার্যকরী রূপ প্রধানতঃ শিক্ষকের সক্রিয় অংশ গ্রহণ, আগ্রহ ও দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। তাই মূল্যায়নের সময় শিক্ষকদের প্রতিন্যাস (Attitude), যোগ্যতা, ইচ্ছে ইত্যাদির তথ্য গ্রহণ করা দরকার।

আর্থ সামাজিক চাহিদা ঃ পাঠক্রম মূল্যায়নের সময় আর্থ-সামাজিক চাহিদা ও বৃত্তির ক্ষেত্রে-এর উপযোগিতা সম্বন্ধে আগাম তথ্য গ্রহণ করার প্রয়োজন। তাছাড়া পাঠক্রমের মধ্যে বৃত্তির চাহিদা ও মৌলিক জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে পাঠক্রম প্রস্তুতির দিকে নজর দেওয়া এই মূল্যায়ন স্তরেই হয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, এই ক্রমিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি পাঠক্রম রচনার প্রথম প্রয়াস থেকে কার্যকরী পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ স্তর পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে।

১০.৪.৩ ক্রমিক মূল্যায়নের গুরুত্ব (Importance of Formative Evaluation) ঃ

সংক্ষেপে মূল্যায়নের গুরুত্ব নীচে আলোচনা করা হল ঃ

(১) ক্রমিক মূল্যায়ন প্রতিটি ধাপে পর্যবেক্ষণ করে পাঠক্রমকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে ত্রুটিমুক্ত করতে সাহায্য করে।

(২) মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পাঠক্রমের গুণাগুণ সম্বন্ধে আগাম ধারণা দিতে পারে।

(৩) পরিকাঠামো ও প্রয়োগ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকায় পাঠক্রম রচনাকালীনই এর প্রস্তুতি পর্ব শুরু হতে পারে।

(৪) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও মানসিক প্রস্তুতির অনেক আগে থেকে শুরু করা যায়।

(৫) পাঠক্রমের ভবিষ্যত পরিণতি ও অন্য পাঠক্রমের সাথে এর তুলনামূলক গুণমান ধারণা করা যায়।

১০.৪.৪ ক্রমিক মূল্যায়নের সমস্যা (Problems of Formative Evaluation) ঃ

ক্রমিক মূল্যায়ন কিন্তু ত্রুটি মুক্ত নয়। এরও কিছু সমস্যা রয়েছে। এগুলি হল—

(১) ক্রমিক মূল্যায়নের সাহায্যে কোন পাঠক্রমের চূড়ান্ত রূপ দিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন।

(২) ক্রমিক মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের লোকজন, বিশেজ্ঞরা, জনসাধারণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশীদার হওয়ায় এটি একটি দীর্ঘকালীন ব্যয় বহুল প্রচেষ্টা।

(৩) ক্রমিক মূল্যায়নে মতভেদের জন্য মূল্যায়নের প্রগতি ব্যাহত হয়।

(৪) ক্রমিক মূল্যায়ন দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া হওয়ায় অনেক সময় চূড়ান্ত রূপ নেবার আগেই পাঠক্রমের উপযোগিতা ও গুরুত্ব কমে যায়।

(৫) যারা পাঠক্রমে রচনা করেন তাদের হাতে পরিকাঠামো বা শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা না থাকায় মূল্যায়নের নির্দেশনাগুলির বাস্তব রূপে অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

১০.৪.৫ অন্তিম মূল্যায়ন (Summative Evaluation) ঃ

এই ধরনের মূল্যায়ন পাঠক্রম চলাকালীন হয়। পাঠক্রম প্রয়োগ করার পর ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা শেষে যে মূল্যায়ন হয় তাকেই বলা হয় অন্তিম মূল্যায়ন। আক্ষরিক অর্থে এটি একটি সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রতিফলন। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিক্রিয়া, পঠন-পাঠনের মান, অসুবিধা, সুবিধে এসবের প্রতিফলন ঘটে। পাঠক্রমে অন্তিম মূল্যায়নের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ—

(১) পাঠক্রম ও তার অন্তর্গত বিষয়বস্তু যে স্তর বা ক্লাসের জন্য নির্বাচিত তা যথার্থ কি-না। শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল ও পঠন-পাঠনের সময় শিক্ষকের অভিজ্ঞতা বিষয়টি জানতে সাহায্য করে।

(২) পাঠক্রমের সময় সীমা যা নির্দিষ্ট করা আছে তা উপযুক্ত কি না তা অন্তিম মূল্যায়নে অনুধান করা যায়।

(৩) পাঠক্রমটি ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা মাফিক হয়েছে কিনা তা জানা যায়।

(৪) পাঠক্রমের বিষয়বস্তু শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্যের সাথে তাৎক্ষণিক লক্ষ্যের সঠিক যোগাযোগ ঘটাতে পারে কি-না।

(৫) শিক্ষা পূর্ববর্তী স্তরের সাথে পরবর্তী স্তরে সাহায্য বজায়ে পাঠক্রম সহায়তা করতে কতটা পারবে তা জানা যাবে।

১০.৪.৬ অন্তিম মূল্যায়নের সুবিধা (Advantage of Summative Evaluation) ঃ

(১) অন্তিম মূল্যায়নের সময় ও অর্থ কম খরচ হয়।

(২) শিক্ষক বা যেহেতু পরিবেশ অন্তিম মূল্যায়ন করতে পারেন তাই এর জটিলতা অনেক কম।

(৩) অন্তিম মূল্যায়নের মাধ্যমে পাঠক্রমের ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা, সম্পূর্ণতা এক যোগে ধারণা পাওয়া যায়।

(৪) পঠন-পাঠনে যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা অন্তিম মূল্যায়নে যুক্ত থাকবে। এই মূল্যায়নের গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরতা অনেক বেশি।

(৫) অন্তিম মূল্যায়ন তথ্য নির্ভর মূল্যায়ন। এটা নিছক যুক্তি নির্ভর অনুমান প্রক্রিয়া নয়।

(৬) অন্তিম মূল্যায়নের পর যদি বৃত্তি বা কোন বিশেষ পাঠক্রম শুরু হয় তা হলে অন্তিম মূল্যায়নের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা সহজ।

১০.৪.৭ অন্তিম মূল্যায়নের অসুবিধা (Disadvantages of Summative Evaluation) ঃ

অন্তিম মূল্যায়নের সুবিধার সাথে সাথে অসুবিধেও পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হল—

(১) একবার পাঠক্রম শুরু হয়ে গেলে অন্তিম মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে পরিবর্তন করা কার্যতঃ প্রায় সম্ভব হয়ে ওঠে না। যদি—পাঠক্রমটি একযোগে অনেক প্রতিষ্ঠান, অনেক ছাত্রছাত্রী যুক্ত থাকলে অন্তিম মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন করতে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়।

(২) শিক্ষকদের যোগ্যতা, নিষ্ঠা ও সততার উপর বেশির ভাগ সময় পাঠক্রমের প্রয়োগের যথার্থতা নির্ভর করে। সুতরাং শিক্ষকের উপরোক্ত গুণাগুণের ঘাটতি থাকলে অন্তিম মূল্যায়নের ফলাফল নির্ভর করবে।

(৩) অন্তিম মূল্যায়নের ফলাফল ছাত্রদের বুদ্ধি, আগ্রহ, প্রেষণা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।

(৪) পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য অনেক ক্ষেত্রে অন্তিম মূল্যায়নের ফলাফল বিঘ্নিত হয় ও তার যথার্থতা সঠিক হতে পারে না।

১০.৫ উপসংহার (Conclusion)

পাঠক্রমের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে বা অন্তিম কালেও হতে পারে। এই দুই মূল্যায়ন পদ্ধতির যেমন সুবিধে রয়েছে তেমনি অসুবিধাও রয়েছে। মূল্যায়নের ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্য, ক্রমাগত উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে ক্রমিক ও অন্তিম মূল্যায়ন উভয় প্রকার মূল্যায়নের প্রয়োজন অনুভব করা হয়ে থাকে।

১০.৬ প্রশ্নাবলি (Questions)

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Eassay type Questions)

১। পাঠক্রমের মূল্যায়ন বলতে কী বোঝায়? মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন। মূল্যায়নের বিভিন্ন ধাপগুলি আলোচনা করুন।

২। পাঠক্রমের মূল্যায়নের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করুন।

৩। পাঠক্রমের ক্রমিক ধারাবাহিক ও অন্তিম মূল্যায়ন সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৪। ধারাবাহিক বা ক্রমিক মূল্যায়ন বলতে কী বোঝায়? এই মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব কতখানি? ক্রমিক মূল্যায়নের সুবিধে ও অসুবিধে নিয়ে আলোচনা করুন।

৫। ক্রমিক ও অন্তিম মূল্যায়নের মূল পার্থক্য কী? অন্তিম মূল্যায়নের সুবিধে ও অসুবিধে নিয়ে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Questions)

১। ক্রমিক মূল্যায়নের গুরুত্ব।

২। ক্রমিক মূল্যায়নের সমস্যা।

৩। অন্তিম মূল্যায়ন।

৪। পাঠক্রমের মূল্যায়ন।

৫। পাঠক্রমের মূল্যায়নের ধাপ।